গান্ধী-চরিতামৃত

‘নেতাজীর জীবনী ও বাণী’, ‘ভারত ছাড়’ প্রণেতা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সিংহ

বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেংগল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

'জয় হোক তপস্বী'

গান্ধীজীর ভাস্বর আত্মার, মহান চরিত্রের, ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের, গভীর জীবন-দর্শনের, বহুমুখী প্রতিভার, বিভিন্ন কর্মধারার বিষয় নিখুঁত ও সম্যকরূপে ভাষায় প্রকাশ করার সামর্থ্য কোন শিল্পীর নাই। তাঁর গভীর জীবন-দর্শন প্রণিধান করা হস্তদ্বারা অত্যুচ্চ হিমালয় পরিমাপ করাব মত দুঃসাধ্য

গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি জীবনের বিভিন্ন কর্মধারাকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং সর্ববিষয়ে একটি সঙ্গতি ও সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিলেন। "গান্ধীজীর জীবনের বহু কর্মধারা ক্রমশঃ একটি সঙ্গীতের ঐক্যতানে পরিণত হয় এবং তাঁর প্রতি বাক্য ও আচার-ব্যবহার যেন ঐ ঐক্যতানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে। তিনি একজন স্বনিপুণ শিল্পী হয়ে উঠেন।" সেইজন্য আমরা তাঁকে একাধারে রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ-সংস্কারক, স্বভাব-চিকিৎসক, সাহিত্যিক, বক্তা, সম্পাদক, শিক্ষকরূপে দেখতে পাই। কিন্তু তিনি তাঁর সকল মতবাদ ও কর্মধারাকে **সত্য ও অহিংসার** কষ্টিপাথরে যাচাই করতেন। সত্য ও অহিংসা ছিল তাঁর জীবনের মস্ত বড় কথা। তাই আমরা তাঁকে সর্বোপরি সত্যাগ্রহী, অহিংসবাদী, সর্বস্ব-ত্যাগী, সর্বহিতব্রতী, কুটিরশিল্প-উন্নয়নকারী, সাম্প্রদায়িক মিলনে বিশ্বাসী, নির্বৈরী, আত্মসমালোচক, সংযম-সারল্য-সৌজন্য-প্রেম-নির্দোষিতার পূর্ণ প্রতীকরূপে দেখতে পাই।

গান্ধীজীর সত্য ভাবলোকের আপেক্ষিক সত্য ছিল না; তাঁর সত্য ছিল শাশ্বত সত্য, চিরন্তন সত্য। সত্যই তাঁর কাছে ভগবান ছিল। তিনি সত্যরূপী ভগবানকে তাঁর সকল কাজের মধ্যে সন্ধান করেছিলেন। ভারতের বিশবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল সত্য ও অহিংসা। অবশ্য এই অহিংসা ও প্রেমের নীতি জগতে নূতন নহে। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য এই বাণী প্রচার করেছিলেন কিন্তু তাঁদের কর্মক্ষেত্র ধর্মজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগেই গান্ধীজীর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে।

গান্ধীজী অতিমাত্রায় ধার্মিক ছিলেন কিন্তু তাঁর মধ্যে ধর্মের কোন গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা ছিল না। ছিল কেবল ধর্মের উদারতা, সার্বজনীনতা। তিনি কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ অকপট ছিলেন। তাঁর মুখের কথা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ মনের কথা। তিনি কোন মতবাদ নিজের জীবনে পরীক্ষা না কোরে সাধারণে প্রকাশ করতেন না। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়—' এই উক্তির সত্যতা গান্ধীজীর জীবনে সম্যক পরিস্ফুট হয়। তাঁর রচনার প্রতি ছত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ছাপ দেখা যায়। তাঁর ভাষা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সংযত ও শক্তিশালী, আড়ম্বর ও অলঙ্কারশূন্য, বাহুল্যবর্জিত ছিল, ভাষায় কোন স্তুতিবাদ বা নিন্দাবাদ ছিল না। 'Style is the man himself' এই উক্তি গান্ধীজীর রচনায় সার্থক হয়েছে। তাঁর চরিত্রের মত তাঁর রচনা সত্য ও অহিংসাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধী-সাহিত্য জগতের অমূল্য সম্পদ।

গান্ধীজী বিশ বৎসর যাবৎ ভারতের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন কিন্তু তিনি নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য কখনও ডিক্টেটরী পন্থা অবলম্বন করেন নি, কখনও জবরদস্তি কোরে নিজের মত অপরের ঘাড়ে চাপান নি। সকলকে

নিজের বিবেক ও বুদ্ধি অনুযায়ী যাচাই কোরে তাঁর মত গ্রহণ করতে বলতেন।

গান্ধীজী ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। তিনি সাফল্যে গর্বিত হতেন না, স্তাবকের স্তুতিতে তাঁর মতিভ্রম হত না। আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। অপমান, লজ্জা, বন্ধুত্ব বা শিষ্য-বিচ্ছেদ, বিরুদ্ধ সমালোচনা, কার্য্যে ব্যর্থতা, দোষ-ত্রুটি, শত্রুর ভ্রূকুটি, নেতৃত্ব হারাবার আশঙ্কা—তাঁকে সত্য ও অহিংসার আদর্শ থেকে একচুলও বিচ্যুত কোরতে পারত না। সেইজন্য আদর্শ-চ্যুতির সম্ভাবনায় তিনি কয়েকবার কংগ্রেসের সংস্রব ও নেতৃত্ব ত্যাগ করেন। জনসাধারণকে চালনা করার তাঁর অদ্ভুত শক্তি ও কৌশল ছিল। তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা নানা মতাবলম্বী লোকদের নিজের আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন, বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে পারতেন, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁর রাজনীতি ছিল কুটনীতিশূন্য, তাঁর কর্মধারায় কোন গোপনীয়তা ছিল না। তিনি সকলের মতের প্রতি সমশ্রদ্ধাশীল ছিলেন। উগ্র বিরোধীর প্রতি কখনও রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেন নি।

গান্ধীজী পাশ্চাত্য সভ্যতার যান্ত্রিক নিয়মানুগত্য, শৃঙ্খলাবোধ, কাজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণাবলী আত্মসাৎ করেছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিকের ন্যায় অতিশয় নিয়ম মেনে বিচারপূর্বক ও সূক্ষ্মভাবে নিজের অহিংস পরীক্ষা সম্পন্ন করতেন।

গান্ধীজীর জীবন ছিল আধ্যাত্মিক ও ঐহিক জীবনের অপূর্ব সংমিশ্রণ কিন্তু তিনি বিশেষ কোন 'Ism' বা ধর্মমত প্রচার করেন নি। তিনি নিছক দার্শনিক, তাত্ত্বিক বা আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, তাঁর বাণী ছিল তথ্যানুগ ও ব্যবহারিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য তাঁর রচনাতে যেমন অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য ও

অহিংসার কথা থাকত তেমন চীনা বাদামের ও আম আঁটির শাসের উপকারিতার কথাও থাকত। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল আত্মার বন্ধন-মুক্তি; কিন্তু তিনি নিভৃত পর্বতগুহায় গিয়ে আত্মোন্নতি চান নি। তিনি চেয়েছিলেন মানব-জাতির কল্যাণে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তি।

গান্ধীজী সাধারণ মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু অনুশীলনের দ্বারা জীবনে তিনি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

দুর্ভাগের বিষয় গান্ধীজী সারা জীবন সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর সাধনার ক্ষেত্র ভারতবর্ষ সত্য ও অহিংসার পথে অগ্রসর হয়েছে বলে মনে হয় না।

সূচী-পত্র

গান্ধী চরিতামৃত

গান্ধীজীর জীবনী

বাল্যে ও কৈশোরে গান্ধীজী

মাতাপিতা—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (সম্বৎ ১৯২৫, ১২ই আশ্বিন) গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দর বা সুদামাপুরীতে গান্ধীজী জন্মগ্রহণ করেন। গান্ধীজী তাঁর পিতার চতুর্থা স্ত্রীর গর্ভে সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর পিতার নাম ছিল করমচাঁদ বা কাবা গান্ধী। মাতার নাম পুতলী বাঈ। ইঁহারা হিন্দু বেনিয়া। এই বংশ বুদ্ধিমত্তা ও সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গান্ধীজীর মাতাপিতা হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। অহিংসা ও প্রেম এই সম্প্রদায়েব মূলমন্ত্র। কাবা গান্ধীর স্কুল কলেজের শিক্ষা বা ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান প্রায় কিছুই ছিল না কিন্তু তাঁর ব্যবহারিক কার্য্যকরী বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রচুর ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে আত্মীয়-স্বজনপ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, সাহসী, উদার কিন্তু রাশভারী। তিনি রাজকোট রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ঘুষ নিতেন না, সর্বদাই ন্যায় বিচার করতেন। একবার রাজ্যের মঙ্গলের জন্য পলিটিক্যাল এজেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁকে কারাবাস করতে হয়। পুতলী বাঈএর বুদ্ধি ছিল প্রখর, গৃহস্থালী কাজে দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তিনি অধিকাংশ সময়ই পূজার্চ্চনা, ব্রত ও উপবাসে কাটাতেন।

শিক্ষা—গান্ধীজীর বাল্যশিক্ষার ভার এক ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই ব্রাহ্মণ তাঁকে বিষ্ণুশর্মা পড়াতেন। গান্ধীজী সাত বৎসর বয়সের সময় পিতার সঙ্গে রাজকোটে আসেন। তিনি সাত হইতে এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাজকোটের পাঠশালায় এবং বার হইতে আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। শৈশব হইতে তিনি খুব লাজুক ছিলেন। তিনি শিক্ষককে কখনও ফাঁকি দিতেন না। কোন সহপাঠির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন না, তাঁর ভয় হ'ত পাছে তাঁকে নিয়ে কেউ মজা করে। তিনি বরাবরই গুরুজনের বাধ্য ছিলেন কিন্তু তাঁদের দুষ্কর্মের অনুসরণ করতেন না। একবার এক ইনস্পেক্টার পাঠশালার ছাত্রদের বানান পরীক্ষা করবার সময় শিক্ষক মহাশয় গান্ধীজীকে সম্মুখের ছাত্রটির বানান নকল করতে বলেন। গান্ধীজী কিছুতেই শিক্ষকের নির্দ্দেশ পালন করলেন না। তিনি পাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই কম পড়তেন। "শ্রবণের পিতৃভক্তি" "রাজা হরিশ্চন্দ্র" নাটক দু'খানি পড়েন। শ্রবণের পিতৃভক্তি ও হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা তাঁর কোমল মনে গভীর ছাপ দেয়। সারাজীবন তাঁরা গান্ধীজীর নিকটে জীবন্ত আদর্শ ছিলেন।

পড়াশুনায় ও সদাচরণে তিনি শিক্ষকদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি স্কুলে কয়েকবার ছাত্রবৃত্তি পান। ইহাতে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল না কারণ স্কুলে ছাত্র সংখ্যা খুব কম ছিল। আচরণের দিকে তাঁর খুব বেশী লক্ষ্য ছিল। আচরণে ত্রুটি হ'লেই তাঁর কান্না আসত। তিনি ব্যায়ামাদি বা খেলাধূলার কোন মূল্য দিতেন না। পরে তিনি বুঝতে পারেন এই ধারণা মারাত্মক। তিনি শৈশব হইতে মুক্ত বাতাসে প্রাতঃভ্রমণে অভ্যস্ত হন। তাঁর হস্তাক্ষরের দিকে কোন যত্ন ছিল না। পরবর্তী জীবনে তিনি এই ভুল বুঝতে পারেন এবং সকলকে সাবধান করে দেন। এক পণ্ডিত তাঁর সংস্কৃত ভাষায় রুচি ফিরাইয়া আনেন। গান্ধীজীর অভিমত

"ভাল হস্তাক্ষর শিক্ষার একটি অঙ্গ এবং সংস্কৃত না শিখিলে কোন হিন্দুর শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া উচ্চ শিক্ষিতদের হিন্দী, আরবী, সংস্কৃত, ফার্সি ও ইংরাজি শিক্ষা করা প্রয়োজন।"

রাম নামের প্রভাব—গান্ধীজীর বাল্যে খুব ভূতের ভয় ছিল। বাড়ীর এক পুরাতন বৃদ্ধা দাসী শিশু গান্ধীজীকে মানুষ করে। তার নাম ছিল রম্ভা। গান্ধীজী তাকে খুব ভালবাসতেন। ভূতের ভয় দূর করার জন্য একদিন গান্ধীজী রম্ভার শরণাপন্ন হ'লেন। রম্ভা তৎক্ষণাৎ এই ব্যাধির ঔষধ বলে দিল—"এই ব্যাধির ঔষধ হ'চ্ছে **রাম নাম**। যে দিন থেকে এই ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে সেই দিন থেকে ভূতপ্রেত মর্ত্যে যাওয়া-আসা কমিয়ে দিয়েছে। রামের মূর্তি স্মরণ করে তিনবার রাম নাম করলেই ভূত-প্রেত পালিয়ে যায়।" রম্ভার কথা বালক বেদ-বাক্যের মত সত্য বলে গ্রহণ করেন। যখনই রাত্রির অন্ধকারে ভূতের ভয় হ'ত তখনই গান্ধীজী চোখ বুঁজে রামের মোহন মূর্তি স্মরণ করতেন আর অবিরাম রাম নাম জপ করতেন। সঙ্কট-ত্রাতা রামমূর্তি বালকের কোমল অন্তরে অধিষ্ঠান করে ভয় দূর করতেন। সামান্যা দাসী বালকের কর্ণে যে মহামন্ত্র শুনায় সেই রামনাম গান্ধীজীর জীবনে অমূল্য পাথেয় ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে যখনই তাঁর মনে কোন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যখনই তাঁর অন্তরে কোন শক্তির উদ্বোধনের তাগিদ এসেছে তখনই তিনি এই মন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। রাম নাম ছিল তাঁর জীবনের পরম নির্ভরতা। আততায়ীর গুলিতে যখন তাঁর বক্ষ বিদ্ধ হয় তখন তাঁর মুখ হইতে শেষ কথা বের হয় **"হা রাম! হা রাম!"** দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন লাঠির আঘাতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন তখনও তাঁর মুখ হইতে এই রাম নাম নির্গত হয়।

রামায়ণের প্রভাব—বিশেশ্বর শিবের মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন

লাধা মহারাজ। পূর্বে মহারাজের কুষ্ঠব্যাধি হয়। তিনি কোন ঔষধ ব্যবহার করেন নি। মহাদেবের নিত্য পূজার পর যে সব বিল্বপত্র পড়ে থাকত সেই বিল্বপত্র ক্ষতস্থানে লেপন করতেন ও মুখে অনর্গল রামায়ণ পাঠ করতেন। মহারাজের বিশ্বাস ছিল যে মহাদেবের প্রসাদে ও রাম নামের মাহাত্ম্যে সকল ব্যাধি দূর হয়। এক দিন সত্যই তিনি রোগমুক্ত হন। তাঁর দেহে কুষ্ঠ-ব্যাধির কোন চিহ্ন ছিল না।

এই লাধা মহারাজ কাবা গান্ধীর রোগ-শয্যার পাশে এসে প্রতিদিন তাঁকে সুললিত কণ্ঠস্বরে রামায়ণ শোনাতেন। গান্ধীজী রুগ্ন পিতার শুশ্রূষা করতেন। তিনি দিনের পর দিন তন্ময় চিত্ত হ'য়ে রামায়ণের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হতেন। রাম নামের মাহাত্ম্যে যে রোগমুক্তি হয় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত লাধা মহারাজের দেহের দিকে তিনি চেয়ে থাকতেন। দশরথের সত্যরক্ষা, রামের পিতৃসত্য পালনের সাহায্যে স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করা, সীতার পতিভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, রামের আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া রাজধর্ম পালন প্রভৃতি ঘটনা গান্ধীজীর কিশোর জীবনকে অমৃত রসসিক্ত করে। যে সব আদর্শ তাঁর পরবর্তি জীবনকে পরিচালিত করে তার বীজ এখানেই উপ্ত হয়।

বাল্য বিবাহ—স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় গান্ধীজীর ও তাঁর মেজ দাদার বিবাহ হয়। তৎকালে ইহাই সামাজিক রীতি ছিল। গান্ধীজীর বয়স তখন তের বৎসর। বিবাহের ফলে তাঁর মেজদার বিদ্যাভ্যাস বন্ধ হয়। গান্ধীজীরও এক বৎসর নষ্ট হয়। এই বিবাহের জন্য পরে তিনি খুব লজ্জিত হ'ন। তিনি কোন যুক্তিতেই বাল্য বিবাহ সমর্থন করতেন না।

মাংস ভক্ষণ—এই সময়ে মেজদার সহপাঠি একটি অসৎ ছেলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ছেলেটি মদ্য-মাংস ভক্ষণ করলে সবল ও সাহসী হওয়া যায় এইরূপ যুক্তি দেখিয়ে গান্ধীজীকে মদ্য-মাংস ভক্ষণ করতে

প্রলুব্ধ করে। ছেলেটির অসৎ চরিত্রের কথা জ্ঞাত থাকিলেও গান্ধীজী তাকে শোধরাবার জন্য তার সংগ ছাড়তেন না। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। গান্ধীজী ছেলে বেলায় ভীরু স্বভাবের ছিলেন সেজন্য মাংস ভক্ষণ করে ছেলেটির মত সাহসী ও সবল হতে তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ'ল। তিনি এক বৎসরে ছেলেটির সঙ্গে পাঁচ ছয়বার মাংস ভক্ষণ করেন। প্রত্যেক বার বাড়ীতে আহারের সময় মাকে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আহার করতেন না। ইহাতে তাঁর মনে ভীষণ আঘাত লাগত। ক্রমে বিবেকের দংশন তাঁহার অসহ্য হয়ে উঠে। প্রতিজ্ঞা করে সেই যে মাংস তিনি ত্যাগ করলেন জীবনে আর কখনও মাংস স্পর্শ করেন নাই।

স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস—ছেলেটি গান্ধীজীর পত্নীর প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়ে তাঁকে ব্যভিচার করতে প্ররোচিত করে। ভগবানের দয়ায় তিনি রক্ষা পান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "স্ত্রীকে যতদিন ভোগের বস্তু ভেবেছি ততদিন এ অবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে যায় নি। যখন পরবর্তি জীবনে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিলাম ও স্ত্রীকে সহধর্মিণীরূপে দেখলাম তখনই এই সন্দেহের মূল নষ্ট হ'ল।"

আত্মহত্যার চেষ্টা—সিগারেটের ধোঁয়া দেখতে তাঁর খুব মজা লাগত। তিনি কাকার পরিত্যক্ত সিগারেট খেতেন। চাকরদের পকেট থেকে পয়সা চুরি করেও সিগারেট কিনতেন। তাঁর পয়সা নাই বলে সিগারেট কিনতে পারেন না এই ধিক্কারে কেদারজীর মন্দিরে আত্মহত্যার জন্য ২।৪ ধুতুরা বীজ ভক্ষণ করেন, পরে আত্মহত্যার আর সাহস হ'ল না। এই ঘটনার পর সিগারেট খাওয়ার আকাঙ্খা চিরতরে তাঁর মন থেকে লুপ্ত হয়। এ সব ঘটনা তাঁর বার তের বৎসর বয়সের কথা।

দোষ স্বীকার—পনর বৎসর বয়সের সময় মাতাপিতার অজ্ঞাতে গান্ধীজী মেজ দাদার পঁচিশ টাকার দেনার জন্য তাঁর হাতের বালার সোনা

থেকে এক তোলা সোনা বিক্রয় করেন। পিতাকে ফাঁকি দেওয়ায় পরে তাঁর মনে খুব অনুশোচনা হয়। তিনি পিতাকে এক পত্রে সমস্ত অকপটে জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নিজ দোষ স্বীকার করাতে পিতা তাঁকে সানন্দে ক্ষমা করলেন। এই সামান্য ঘটনায় সত্যের ও অহিংসার জয় তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি শিক্ষা করেন, দোষ স্বীকারই দোষস্খালনের সর্বোত্তম পন্থা।

সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা—মাতাপিতার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন মন্দিরে যেতেন। পিতার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের সাধু ও বন্ধুদের ধর্মচর্চা শুনতেন। ইহাতে তাঁর সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা জন্মায়। তিনি বুঝতে পারেন, "সংসার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীতি মাত্রেরই মুল হইল সত্য।" তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল এই সত্যের সহিত পরীক্ষা।

বিলাতে ছাত্র গান্ধীজী

বিলাত যাত্রা—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতৃহীন হন। দু'বৎসর পর তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে কিছুদিন ভবনগর কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি কলেজে অধ্যাপকদের বক্তৃতা ভালরূপ অনুধাবন করতে পারতেন না। কলেজের পড়াশুনা বা আবহাওয়া তাঁর মনঃপূত হ'ল না। সেই সময় তাঁর পিতৃবন্ধু মাভজী ডাভে তাঁকে বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য পাঠাতে পরামর্শ দিলেন যাহাতে পিতার গদীতে বসবার সুবিধা হয়। গান্ধীজী কলেজে পড়ার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। গোল বাধল মায়ের অনুমতি নিয়ে। ধর্মভীরু মার মন এই প্রস্তাবে চঞ্চল হয়ে উঠল। শেষে সাধু বিচারজী স্বামীর পরামর্শ অনুসারে তিনি অনুমতি

দেন। গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে মার নিকট শপথ করেন, "আমি বিলাত যাইয়া মদ, মাংস ও নারী স্পর্শ করব না। আমি তোমাকে এই বিষয় সার্টিফিকেট দেখাব।" তখনকার বেণিয়া সমাজ বিলাত যাইলে গান্ধীজীকে সমাজ-চ্যুতির ভীতি প্রদর্শন করে। গান্ধীজী ব্যক্তিগত ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করেন।

জাহাজে অস্বস্তিকর অবস্থা—জাহাজে একজন ভারতীয় উকিল ও খালাসী ছাড়া সকলেই সাহেব যাত্রী ছিলেন। গান্ধীজী একে লাজুক, মুখ দিয়া কথা বেরোয় না, তার উপর ইংরাজীতে কথা বলতে গলদঘর্ম হতেন। মনে মনে ইংরাজীকে ব্যাকরণসম্মত করতে করতে প্রশ্নকর্ত্তা মৌনতায় বিস্মিত হতেন। অনভ্যস্ত কানে সাহেবী বুলি বুঝে উঠতে পারতেন না। তিনি কাটা চামচের ব্যবহার জানতেন না। ভোজনাগারে খাদ্যের সঙ্গে মাংস আছে কি নাই বোঝবার উপায় নাই। সেইজন্য তিনি কেবিনেই সন্দেশ মিঠাই খেয়ে দিনপাত করতেন। কথা বলবার ভয়ে জাহাজের ডেকে কদাচ যেতেন, কেবিনেই বদ্ধ হয়ে থাকতেন। গেঁয়ো ছেলেকে সহরে ছেড়ে দিলে সে যেমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে যায় গান্ধীজীর অবস্থা সেইরকম হ'ল। কৈশোরের সেই সলজ্জভাব, সেই নির্বাকতা, সেই ইংরাজী ভাষার ভীতি ভবিষ্যৎ জীবনে কোথায় অন্তর্হিত হ'ল? তাঁর রচিত ইংরাজী ভাষা খাস ইংরাজেরও ঈর্ষার বস্তু। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর মুখনিঃসৃত কথামৃত পান করিয়া কত শিক্ষা পেয়েছি আমরা। এই আশ্চর্য পরিবর্তনের কারণ—তিনি বিশ্বাস করতেন "মানুষ পরিশ্রম, অনুশীলন ও তপস্যাব দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারে।"

আত্মপ্রবঞ্চনা বড় অপরাধ—জাহাজে একজন ইংরাজ সহযাত্রী গান্ধীজীর নির্জনতা ও অস্বস্তিকর ভাব লক্ষ্য করেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করেন। তিনি মাংস ভক্ষণের অনুকূলে

বহু যুক্তি দেখান। গান্ধীজী বলেন, "আমাকে যদি ভারতবর্ষে ফিরতে হয় তাতে রাজী আছি কিন্তু মার কাছে শপথ ভঙ্গ করব না।" গান্ধীজীর অনুরোধে এই ইংরাজ যাত্রী তাঁকে মাংস খান নাই বলে একখানি সার্টিফিকেট দেন। গান্ধীজী বিলাতে গিয়া দেখলেন মাংস খেয়েও এইরূপ বহু সার্টিফিকেট যোগাড় করা যায়। ইহাতে তাঁর নীতিবোধে আঘাত লাগল। মুখের কথারই বেশী মূল্য থাকা উচিৎ। আত্মপ্রবঞ্চনার প্রথম সুযোগেই তিনি সাবধান হ'ন।

গীতা পাঠ—দু'জন থিয়জফিষ্ট বন্ধু তাঁকে গীতাপাঠে উৎসাহিত করেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের শ্লোকগুলি তাঁকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। বাইবেলের "Sermon on the Mount" তাঁর মনে খুব প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় তিনি জীবনে ভিতর ও বাহিরে পরিবর্তন আনা আবশ্যক মনে করেন। এই সময় তাঁর মন হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে দুলতে থাকে। পরে তিনি বুঝতে পারেন "কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাঁর পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব।'

শপথ পালন—বিলাতে এসে তিনি প্রথম দিন এক হোটেলে ওঠেন। মাংস খাবার ভয়ে তিনি হোটেলের কোন খাদ্যই গ্রহণ করলেন না, সামান্য মিঠাই যাহা সঙ্গে ছিল তাহা খেয়ে উপবাস হ'তে নিজেকে বাঁচালেন। বিনা আহারে এক দিনের হোটেল খরচা ৪৫৲ টাকা লাগাতে তিনি অবাক হন। ডাঃ মেহেটা (দাদার বন্ধু) তাঁকে ইংরাজ সমাজের রীতিনীতি ও শিষ্টাচারের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবার জন্য এক ইংরাজ বন্ধুর বাড়ীতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। সেই বন্ধুটি তাঁকে ছোট ভাইয়ের মত ইংরাজি রীতিনীতি শেখালেন। কিন্তু তাঁর খাদ্য নিয়ে মহা ঝঞ্চাট উপস্থিত হ'ল। সিদ্ধ শাকসব্জী খেয়ে অর্ধ উপবাসে তাঁর দিন কাটতে লাগল। যা দু'তিন টুক্‌রো রুটি খেতে দেওয়া হ'ত বিলাতী শিষ্টাচার অনুযায়ী তার

বেশী তিনি চাওয়া অভদ্রতা মনে করতেন। বন্ধুটি তাঁকে মাংস গ্রহণ করাবার অনেক চেষ্টা করলেন। এমন কথাও বললেন, "অশিক্ষিতা মার সামনে এরকম শপথের কোন অর্থ হয় না।" তিনি গান্ধীজীকে বেন্থামের Theory of Utility পড়ে শোনালেন। মানসিক সততা তাঁর ছিল প্রচুর। তিনি স্পষ্টতঃ বন্ধুকে বললেন, "এই পুস্তকের অর্থ আমি ভাল বুঝতে পারি নাই। আমাকে মূর্খ মনে করে ক্ষমা করুন। আপনার স্নেহের মর্যাদা আমি বুঝি কিন্তু ভুল হোক, অন্যায় হোক, আমার মা অশিক্ষিতা হ'ন, আমাকে শপথ রাখতেই হবে।" বন্ধুটি তখন হাল ছেড়ে দিলেন। একমাস বন্ধুটির বাড়ী থাকার পর তিনি এক Anglo-Indian ভদ্রলোকের বাড়ী গেলেন। সেখানেও সেই খাদ্য সমস্যা। নিরামিষ ভোজনে একরকম অর্ধাশনে তাঁর দিন কাটত। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন নিরামিষ ভোজীদের এক হোটেলের সন্ধান পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সেইদিন তিনি বিলাতে প্রথম পেট পুরে আহার করলেন। সেখান হতে সল্টএর Plea for Vegetarianism নামক পুস্তক কিনে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। তিনি বুঝতে পারেন, অশিক্ষিতা মায়ের কাছে শপথ গ্রহণে কোন ভয়াবহ অন্যায় বা অবৈজ্ঞানিক কিছু হয় নাই, বরঞ্চ নিরামিষ ভোজনের সপক্ষে অনেক যুক্তি তর্ক আছে। সেই দিন হ'তে তাঁর সারা জীবনের খাদ্য সম্পর্কে একটি ধারা নির্দিষ্ট হ'ল। তিনি মশলা, চা, কফি খাওয়া ছেড়ে দেন। তিনি বুঝতে পারেন—স্বাদের মূল জিহ্বা নয়—মন।

বিলাতে গিয়া প্রথমে তাঁর মানসিক অবস্থা খুব খারাপ হয়। কাহারও সঙ্গে আলাপ করার তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। মা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য তাঁর মন কেমন করত। রাত্রি হলে তাঁর কান্না আসত।

সাহেব সাজার সাধনা "(Aping the English gentleman)".

—খাদ্য সম্বন্ধে বন্ধুরা তাঁকে "গেঁয়ো" ভাবত। সেইজন্য তিনি ইংরাজ সমাজের কৌলিন্যের লক্ষণ—পোষাক, নাচগান, কথাবার্তায় অঙ্গভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ, বক্তৃতা প্রভৃতি শিক্ষা করার সংকল্প করলেন। বোম্বাইএর পোষাক ছেড়ে লণ্ডনের ফ্যাসানের স্যুট তৈরী করালেন। তিনি দশ মিনিট ধরে আয়নার সামনে নানা প্রলেপ দিয়ে খোঁচা খোঁচা চুলগুলিকে মসৃণ করা ও ব্রাস দিয়া দুরস্ত করা, টাই বাঁধা অভ্যাস করলেন এবং উঠা-বসা করতে হাতের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী কসরৎ করলেন। নাচ শিখবার জন্য ৪৫৲ টাকা ফি দিয়ে তিনি নাচের ক্লাসে ভর্তি হলেন। কোন রকমে পা তোলা ও ফেলা অভ্যাস করলেন, কিন্তু পিয়ানোর স্বরের তালে পা ফেলতে পারলেন না। তখন তিনি স্বরতাল শিখবার জন্য কিনলেন ৪৫৲ টাকায় এক বেহালা। আবার বেহালা শিখবার জন্য রাখলেন এক শিক্ষক। এ ঠিক গল্পের সন্ন্যাসীর বিড়াল রাখার মত। কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যও এক শিক্ষক রাখলেন ও পুস্তক খরিদ করলেন। তিন মাস এইরূপ পাগলামি করার পর বেণিয়ার বংশধর হিসাব করে দেখলেন পোষাকী ভদ্রতা শিখতে তাঁর বহু ব্যয় হয়েছে। ভাবলেন—পালিশ অর্জনের মূল্যই বা কতটুকু! তাঁর মন থেকে এই মোহ অন্তর্হিত হল। তিনি অকপটে এই মোহের কথা সকল শিক্ষককে জানাইয়া দেন। তৎপরে তিনি নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

সরলতা শিক্ষা—এই সময় তিনি নিজের খরচ খুব সংক্ষেপ করেন। তিনি সমস্ত খরচের পাই পয়সা হিসাব রাখতেন। এই অভ্যাসের ফলে তিনি পরবর্তি জীবনে সাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পরিষ্কার হিসাব দিয়েছেন এবং কোন বেহিসাবি খরচ করেন নাই। পরিবারে থাকলে অতিথি সৎকারে বেশী খরচ হয় সেইজন্য তিনি দু'কামরা ঘর ভাড়া নিলেন। তিনি

গাড়ী চড়া ছেড়ে হাঁটতে আরম্ভ করেন। সরল জীবন যাপনের অনেক বই কিনলেন। শেষে তিনি এক কামরা ছেড়ে দিলেন। সকালের ও সন্ধ্যার খাবার ষ্টোভে তিনি নিজে করতে লাগলেন, তাও আবার রুটি ওটমিল পোরিজ। প্রত্যহ খরচ প'ড়ত প্রায় এক টাকা। তিনি দ্বিতীয় বারে লণ্ডনের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। পারিবারিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানর জন্য এবং ভিতর ও বাইরের ঐক্য স্থাপনের জন্য তিনি এইরূপ খরচ সংকুচিত করেন।

বক্তৃতায় ব্যর্থতা—গান্ধীজী লণ্ডনে একটি নিরামিষ ক্লাব গঠন করেন কিন্তু কোন দিনই ক্লাবে মুখ ফুটে তাঁর কথা বেরোল না। তাঁকে Vegetaranian Societyর সভ্য করা হয়। বন্ধুদের ভৎ'সনায় অনেক চেষ্টা করেও বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যেত, দাঁড়াবার শক্তি থাকত না।

একবার এই সোসাইটির একটি বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রত্যেক সভ্যকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। গান্ধীজী তাঁর বক্তব্য কাগজে লিখে নিয়ে এলেন। সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে লেখা পড়তেই পারলেন না, চোখে ঝাপ্‌সা দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি সভাপতির হাতে কাগজ দিয়ে গম্ভীর হয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়লেন। পরের দিন তিনি লজ্জায় কমিটির সভ্য পদে ইস্তফা দিলেন। তিনি মৌনতার লজ্জা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিনে চেষ্টা করে দূরীভূত করবেন সংকল্প করলেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি বিদায় ভোজের আয়োজন করলেন। ইচ্ছা ছিল যে এই ভোজ সভায় ইংরাজি রীতি অনুসারে ভোজনান্তে বক্তৃতা করবেন এবং পরিহাসচ্ছলে নিজের বক্তৃতার ভয়ের কথা উত্থাপন করবেন এডিসনের বিখ্যাত কাহিনী দিয়ে। সভায় ভোজনান্তে তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানাতে উঠলেন এবং কোন রকমে শুষ্ককণ্ঠে বললেন, "আপনারা জানেন এডিসন তিনবার con-

ceive করেছিলেন।" কিন্তু তাঁর মুখে আর কথা সরে না, তিনি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ "আপনারা আমার নিমন্ত্রণে এসেছেন, এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ" এই কথা বলেই ঘর্মাক্ত কলেবরে চেয়ারে বসে পড়লেন। এই ব্যক্তি কি প্রকারে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসিক আলাপী হলেন এবং লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা দিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়।

প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা—পোর্টস্‌মাউথে নিরামিষবাদীদের এক সভায় গান্ধীজী আহুত হয়ে যান। সেখানে এক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে তাঁদের বাসস্থান হয়। সেখানে মেয়েদের সঙ্গে তাস খেলতে খেল্‌তে তাঁরা অশ্লীল কথাবার্তা সুরু করলেন। তাঁর এক বন্ধুও ছিলেন সেই দলে। স্ফূর্ত্তি যখন কথা হ'তে কাজে পরিণত হতে যাচ্ছিল, তখন সেই বন্ধুর কণ্ঠে ভগবান গান্ধীজীকে বললেন "এই পাপ তুমি করবে? পালাও এখান থেকে।" তাঁর হুঁস হ'ল, মার কাছে প্রতিজ্ঞা মনে পড়ল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে নিজের কামরায় এলেন। জীবনে ভগবান এইরূপ অনেক সংকটে তাঁকে বাঁচিয়েছেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের পথে প্যারিসে সাতদিন ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী গান্ধীজী

ভারতে ব্যারিষ্টারি—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারি পাশ করে তিনি ১২ই জুন ভারতের দিকে যাত্রা করেন। ইহার কয়েক দিন পূর্বে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। চার পাঁচ মাস বোম্বাইতে ব্যারিষ্টারি করে তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বের হ'ত না। তৎপরে রাজকোটে ব্যরিষ্টারি করে তিনি মাসে ৩০০৲ টাকা উপায় করতে থাকেন। একবার পলিটিক্যাল

এজেণ্টের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে পোরবন্দরের দাদা আবদুল্লার কোম্পানীর আমন্ত্রণে দক্ষিণ আফ্রিকায় এক মামলা পরিচালনার জন্য তিনি নাটালে যান। এই মামলায় প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ও খাওয়া খরচ বাদ তিনি মাসিক ১৫০ পাউণ্ড পান।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনে হাতে খড়ি হয়। ১৮৯৩ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ এই বিশ বৎসর গান্ধীজীর অক্লান্ত কর্মের স্থান ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। "এই বিশ বৎসর ছিল একটা আত্মার যুগ।" এই সময়ে একজন সত্যাগ্রহীর বিরাট আত্মিক শক্তি ও অটল আত্মত্যাগ হিংসার উপর চূড়ান্ত জয়লাভ ঘটাইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় দেড় লক্ষ ভারতবাসী বাস করত। এই বিদেশীদের পরিশ্রমের ফলে জঙ্গলময় দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেত অধিবাসিদের বাসোপযোগী হয়। কিন্তু শ্বেত অধিবাসিরা পরে ইহাদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব দেখান। ভারতবাসীদের তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। তাহাদিগের বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র চলে। দুর্বহ ট্যাক্স, লিন্‌চিং, বলাৎকার, অসম্মানকর আইনকানুন, দলে দলে উৎপীড়ন, নিয়মিত নির্য্যাতন প্রভৃতি ব্যাপার পাশ্চাত্য সভ্যতার আবরণে চলতে থাকে। ট্রেণে, বাসে, রাস্তাঘাটে কালা ও ধলার পৃথক ব্যবস্থা ছিল। এই বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজী সুরু করেন এক অহিংস সংগ্রাম যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে মেলে না। এই অহিংস সংগ্রামই পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়ন করে।

প্রথম প্রবাস—দাদা আবদুল্লা থাকতেন নাটালের ডারবানে। মোকদ্দমা চলছিল প্রিটোরিয়ার আদালতে। গান্ধীজীকে এই মোকদ্দমার জন্য ডারবান থেকে প্রিটোরিয়াতে যেতে হয়। গান্ধীজী তখন ব্যারিষ্টারী ফ্রক কোট ইত্যাদি পরেন এবং মাথায় পাগড়ী বাঁধেন। তিনি ট্রেণে প্রথম শ্রেণীর টিকেট কেনেন। (ভারতবাসিদের সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীতে

ভ্রমণ করতে হ'ত।) নাতালের রাজধানী মরেৎজবর্গে ট্রেণ পৌঁছিলে গার্ড এসে তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে বলে। গান্ধীজী তাহা অস্বীকার করাতে সিপাহী এসে ধাক্কা মেরে তাঁকে গাড়ী থেকে নীচে নামিয়ে দিল এবং তাঁর জিনিষপত্র নামিয়ে ফেলল। তখন সেখানে অত্যন্ত শীত। সারারাত্রি তিনি শীতের মধ্যে বসে কাটালেন। পরদিন রাত্রিতে আবদুল্লা শেঠের বন্ধুদের হস্তক্ষেপে ট্রেণে প্রথম শ্রেণীতে তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেণ চার্লস টাউনে গিয়ে শেষ হয়। চার্লস টাউন থেকে ঘোড়ায় টানা বাসে অনেকটা পথ যেতে হয়। কিন্তু তাঁকে বাসে চালকের পাশে বসতে হল। কতক পথ যাওয়ার পর বাসের কণ্ডাক্টর তাঁকে পাদানে বসতে বলে। তিনি অস্বীকার করাতে ঐ ব্যক্তি তাঁকে অত্যন্ত প্রহার করতে ও গালাগালি করতে থাকে। পরে কতকটা রাস্তা আবার ট্রেণে যেতে হয়। অনেক চেষ্টায় যদি বা প্রথম শ্রেণীর টিকিট মিলল, পথে গার্ড আবার তাঁকে নামিয়ে দিতে চায়। এইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে গান্ধীজী ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ায় পৌঁছেন।

ট্রান্সভালে ভারতীয়দিগকে ফুটপাথে চলতে দেওয়া হয় না। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ীর সম্মুখের ফুটপাত দিয়ে যাওয়ার সময় একদিন একজন বুয়ার পাহারাওয়ালা গান্ধীজীকে ধাক্কা দিয়া ফেলে দেয় এবং লাথি মেরে ফুটপাথ থেকে নামিয়ে দেয়। মিঃ কোটস (গান্ধীজীর বন্ধু) সেপাইকে ধমকে দেন। কোটস গান্ধীজীকে মামলা করতে বলেন, গান্ধীজী তাতে সম্মত হন না।

গান্ধীজীর চেষ্টায় আবদুল্লার মোকদ্দমা মিটমাট হয়ে যায়।

নেটালে ভারতীয় কংগ্রেস—মোকদ্দমা শেষ হয়ে যাওয়াতে তিনি ১৮৯৪ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন বলে স্থির করেন।

সেই সময় নাটালের ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয়দের ভোটের অধিকার উঠিয়ে নেওয়ার জন্য বিল উত্থাপিত হয়। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ভারতে প্রত্যাবর্তন স্থগিত রাখেন। ঐ বিলের প্রতিবাদ করে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের স্বাক্ষরিত একখানা দরখাস্ত নাটাল ব্যবস্থা পরিষদে প্রেরিত হয়। জীবিকা অর্জনের জন্য এই সময় তিনি ডারবানে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি নাটাল **ভারতীয় কংগ্রেস** গঠন করেন। চারিদিকে সভাসমিতি হতে লাগল, চাঁদাও অনেক উঠল, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন হ'ল। দশ হাজার লোকের স্বাক্ষরে এক দরখাস্ত উপনিবেশ মন্ত্রীর নিকট পাঠান হ'ল। "দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী প্রত্যেক ইংরাজের প্রতি নিবেদন" আর "ভারতীয়দের ভোটের অধিকার সম্পর্কে আবেদন" নামক দুইখানি পুস্তিকা লিখে তিনি প্রচার করেন। গান্ধীজীর দেশের কাজে এই হাতেখড়ি হ'ল।

মনীষী টলষ্টয়ের গ্রন্থগুলির সহিত এই সময় তাঁর পরিচয় হয়। টলষ্টয়ের মতবাদ তাঁর মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। ১৮৯৬ সালে তিনি পরিবার নিয়ে যেতে পুনরায় ভারতবর্ষে আসেন।

ভারতে ছয় মাস—ভারতে এসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখে দেশময় বিতরণ করেন। বোম্বাইতে ফিরোজ শা মেটা ও ওয়াচাজার সহানুভূতি ও সাহায্যে তিনি সভা আহ্বান করেন। এই সময়ই গোখলে ও লোকমান্য তিলকের সহিত তাঁর পরিচয় হয়। মাদ্রাজেও খুব বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সংবাদপত্রগুলির সহানুভূতি আকর্ষণেও তিনি সমর্থ হন। এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাঁর যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম আসে। ১৮৯৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তিনি ডারবানে (নাটালের বন্দর) পৌছেন। দুইটি জাহাজে প্রায় আটশত ভারতবাসী ছিল।

ডারবানে আক্রমণ—গান্ধীজী ভারতবর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে যে প্রচারকার্য্য করেন, তাহার বিকৃত ও অতিরঞ্জিত বিবরণ শুনে এবং গান্ধীজীর সঙ্গে আটশত ভারতবাসী আসাতে সেখানকার ইংরেজ বাসিন্দারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। দুইটি জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছালে তারা গান্ধীজীর প্রাণনাশের ভয় দেখাল। প্লেগের অজুহাত দেখিয়ে যাত্রীদের তীরে নামতে দেওয়া হ'ল না। তেইশ দিন পরে ১৩ই জানুয়ারী গান্ধীজী তীরে অবতরণ করেন। তৎপূর্ব্বে কস্তুরীবাই ও ছেলেদের গাড়ীতে করে রুস্তমজীর বাড়ীতে পাঠান হ'ল। গান্ধীজী ও তাহার বন্ধু মিঃ লাটন সন্ধ্যায় রাস্তা দিয়া চলতে থাকেন। জনতা তাঁকে আক্রমণ করে এবং ভীষণভাবে মারধর করে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্নী ঐ সময় ঐ স্থান দিয়া যাচ্ছিলেন। তিনি ছাতা আড়াল দিয়া গান্ধীজীকে রক্ষা করেন। তারপর গান্ধীজীকে মারবার জন্য সন্ধ্যাকালে অসংখ্য লোক তাঁর বাড়ীর চারদিকে সমবেত হয়। পুলিশ সাহেব একদিকে হাসি ঠাট্টা করে জনতাকে অন্যমনস্ক রাখেন এবং অপরদিকে গান্ধীজীকে ছদ্মবেশ পরিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে রেখে রক্ষা করেন। নেটাল গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজীকে আক্রমণকারিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার উপদেশ দেন কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন কারণ তিনি বলেন, তারা ভুল সংবাদ পেয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছিল। এই ঘটনায় সত্যাগ্রহের পথ সুগম হয়।

গান্ধীজী আবার কংগ্রেসের ও ভারতীয়দের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সেবাকার্য—এই সময় শারীরিক সেবাকার্যের প্রতি এবং জীবনে সরলতার প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ জন্মে। এক অক্ষম কুষ্ঠরোগীকে বাড়ীতে রেখে তিনি তার ঘা নিজহাতে কয়েকদিন ধুইয়ে দেন। রুস্তমজী হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবকভাবে প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা রোগীর সেবা করতে

লাগ্‌লেন। এই কাজে তাঁর তিনটি শিক্ষা হল—সেবাকার্য শিক্ষা, দুঃখী ভারতবাসীর সাহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও জীবনকে সরল করা। তিনি সংসারের খরচপত্রও কমিয়ে দিলেন। তিনি নিজে ধোলাই বিদ্যার বই কিনে ধোলাই করা শিখলেন, স্ত্রীকেও শিখালেন। এতে খরচ কমল, জামা-কাপড়ের সংখ্যা কমল, তিনি নূতন কাজের আনন্দও পেলেন। বন্ধুরা তাঁর ধোলাই-করা জামা কলার দেখে ঠাট্টা করতেন।

পুণ্যস্মৃতি—গান্ধীজীর বাসায় সর্বদা কয়েকজন বন্ধু ও কেরাণী বাস করতেন। ইহারা রাত্রিতে ঘরের ভিতর একটি পাত্রে প্রস্রাব করতেন। গান্ধীজী ও কস্তুরীবাই সেই সব পাত্র পরিষ্কার করতেন। কেরাণীদের মধ্যে একজন অস্পৃশ্য জাতীয় খৃষ্টান ছিলেন। তার পাত্র কস্তুরীবাই পরিষ্কার করতেন কিন্তু নীরবে চোখের জল ফেলতেন। গান্ধীজী একদিন তাঁকে ধমক দেন, "যদি করতে হয় হাসিমুখে কর।" ইহাতে কস্তুরীবাই অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, "তবে তোমার ঘর তুমি সামলাও, আমি চললাম।" গান্ধীজী নির্দয়ভাবে তাঁকে দরজা পর্যন্ত হাত ধরে টানলেন। তখন কস্তুরীবাই কেঁদে বললেন, "তোমার কি লজ্জা সরম নাই, লোকে কি বলবে? স্ত্রীলোক বলে কি তোমার অত্যাচার সহ্য করতে হবে।" গান্ধীজী লজ্জিত হয়ে নিরস্ত হন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এইরূপ ঝগড়া অনেকবার হয়েছে। কস্তুরীবাই সহ্যশক্তি দ্বারা প্রত্যেকবার জয়লাভ করেন। গান্ধীজী স্ত্রীর শিক্ষকরূপে কাজ করতেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁরা পরস্পরের প্রতি নির্বিকার থেকে বন্ধু হিসাবে কাটিয়েছেন। কস্তুরীবাই ছিলেন নিঃস্বার্থ সেবিকা। গান্ধীজীর আদর্শ জীবন যাপনে তিনি কখনও বাধা দেন নাই।

বুয়োর যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০০)—দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ ও বুয়োরেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। তখন গান্ধীজী ভাবতেন, ইংরাজ সাম্রাজ্য ভারতের পক্ষে কল্যাণকর এবং ইংরাজের বিপদে সাহায্য করা কর্তব্য।

সেইজন্য তিনি একটি সেবাদল গঠন করেন। এগার শত ভারতীয় সেবাদলে যোগ দেয়। ইহারা যুদ্ধের সীমানার মধ্যে গিয়াও আহতের সেবা করতেন। ইহারা নিঃস্বার্থ সেবাকার্য্যের জন্য বিরুদ্ধবাদী ইংরাজদেরও প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ভারতবাসীদের মর্যাদাও বাড়ে। প্রভু সিং নামক একজন ভারতীয়কে লর্ড কার্জন পুরস্কার দেন। উৎপীড়ক বিপদে পড়লেও তিনি ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শ নিয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করলেন।

সাধারণের উপহার—ভারতবর্ষ তাঁর কর্মক্ষেত্র ভেবে তিনি স্বদেশে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হলেন। বন্ধুরা সর্ত দিলেন যদি দরকার হয় তবে তাঁকে এক বৎসরের মধ্যে ফিরতে হবে। বিদায় নেবার দিনে তাঁকে নাটালবাসীরা বহু সোণা রূপা হীরা জহরত ও গহনা উপহার দিলেন। কস্তুরীবাইকে এক বন্ধু একটি জড়োয়া হার উপহার দেন। এই নিয়ে মহা সমস্যা দেখা দিল। এত টাকার জিনিষ ছাড়া শক্ত, নেওয়া আরও শক্ত। তাঁর অধিকার বা কি? অর্থের জন্য তিনি সেবা করেন নি। তখন দামী জিনিষ তিনি ঘরে রাখতেন না, সাদাসিদে ভাবে জীবন যাপন করতেন। অনেক ভেবেচিন্তে একটি ট্রাষ্টের হাতে সব দেবেন স্থির করলেন। এই প্রস্তাবে ছেলেরা সহজেই রাজি হল। কস্তুরীবাই কিছুতেই রাজি হন না। তিনি তর্ক করলেন, "তোমার কি? নিজে বৈরাগী হয়েছে, ছেলেদের বৈরাগী করেছ? আমিও চাই না। বউরা ঘরে এলে গহনা দিতে হবে ত।" কস্তুরীবাইএর মুখে বাক্যস্রোত, চোখে অশ্রুস্রোত। গান্ধীজী সহাস্যে বললেন "এমন বউ আনব যে গহনার জন্য পাগল হবে না, আর যদি দিতে হয়, আমি দেব।" কস্তুরীবাই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, "বললেন তুমি সেই লোক না —যে আমারই গহনা খুলে নিয়েছে সে আবার আমার বউকে গহনা দেবে। আমাকে যে হার দিয়েছে তাতে তোমার কি?" যাহা

হউক অনেক তর্কের পর কস্তুরীবাইকে তিনি রাজি করালেন। ট্রাষ্টিদের হাতে সমস্ত টাকাকড়ি গহনা দেওয়া হল। গান্ধীজীর দৃঢ় অভিমত এইরূপ ছিল—জনসেবা কার্যের জন্য জনসেবক যে উপহার পান তাতে তার কোন অধিকার নাই। জনসেবাতেই তা খরচ করা উচিৎ।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন—গোখলের সহিত ভারতবর্ষের সেবা করার ইচ্ছায় গান্ধীজী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দেশে ফেরেন। তাঁর চেষ্টায় ওয়াচার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব অনুমোদন করান সম্ভব হয়। তখন কংগ্রেস নরমপন্থীদের দখলে। এই প্রথম গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি কিছুদিন ভারত ভ্রমণ করেন। গোখলে গান্ধীজীকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তিনি গান্ধীজীকে বোম্বাইতে ব্যারিষ্টারি করতে ও সেই সঙ্গে দেশ সেবা করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু গান্ধীজী নিজের যোগ্যতার অভাব বুঝে প্রথমে রাজকোটে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর তিনি বোম্বাইতে অফিস খুলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে অন্যদিকে টানছে। চেম্বারলেন ভারতীয় আবেদনের তদন্তের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় আসছেন। সেইজন্য তাঁর সেখান থেকে ডাক এল। তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত পোঁটলা পুঁটলি বেধে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হলেন। এবার সুরু হ'ল দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ব্যাপী অহিংস সংগ্রাম।

নূতন আলোক—ইংরাজরা বুয়োর যুদ্ধে ভারতবাসীদের সেবাকার্য ভুলে গিয়ে তাদের নানা বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। সেই জন্য গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘকাল থাকবার সংকল্প করলেন। তিনি নাটালে চেম্বারলেনকে ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ অবগত করান। ইহাতে সুফল হ'ল না। তিনি জোহান্সেবার্গে বাড়ী ভাড়া নিয়ে ব্যারিষ্টারি

আরম্ভ করেন। এখানে তাঁর পসার এত বেড়ে যায় যে তিনি ইংরেজ সহকর্ম্মী গ্রহণ করেন এবং সাত-আটজন কেরানী রাখেন। তিনি একদিকে সম্প্রদায়ের সেবা অন্যদিকে নূতন দৃষ্টিতে গীতাপাঠ সুরু করলেন। থিয়জফিষ্ট সমাজ তাঁর ধর্ম্ম-পিপাসা বর্ধিত করে। গীতার সমস্ত শ্লোকগুলি তিনি কণ্ঠস্থ করলেন। গীতা তাঁর সকল আচরণের গুরু হয়ে উঠল। অভিধানে যেমন কঠিন শব্দের অর্থ দেখা হয় তেমনি কোন বিষয়ে সন্দেহ হলে তিনি গীতায় তার উত্তর খুঁজতেন। 'অপরিগ্রহ' 'সম-ভাব' তাঁকে পেয়ে বসল। "উপকারী, অপকারী, শত্রু-মিত্র, কি করে এক ভাবা যায়? দেহ, স্ত্রী-পুত্র, বই এ সব কি পরিগ্রহ নয়? এসব ছেড়ে কি তীর্থ যাত্রা করব? ঘর বার জ্বালিয়ে ছাই না করলে তীর্থ যাত্রা হয় না" এই সব নানা চিন্তায় তিনি দিন-রাত ডুবে থাকতেন। ট্রাষ্টি বহু টাকা রাখেন কিন্তু এক পয়সাও ভোগ করেন না-এর নামই অপরিগ্রহ। তিনি বোম্বাইতে দশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করেছিলেন। অপরিগ্রহের অন্য তিনি তার করে পলিসি রদ করলেন। দাদাকে লিখলেন, "আমার সাহায্যের আশা ছেড়ে দিন; এখন থেকে যা বাঁচবে জনসেবায় লাগাবো।" গীতার আদর্শে তাঁর মনস্তত্ব গড়ে উঠল। তিনি ছিলেন একখানি জীবন্ত গীতা, নিষ্কাম কর্মের মূর্ত প্রতীক।

"Indian Opinion"—১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নাটালে একটি প্রেসের স্বত্ব তাঁর হাতে আসায় তিনি Indian Opinion নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের কথা, সত্যাগ্রহের ও ধর্মনীতির কথা লেখা হত। ইহাতে অতিরঞ্জিত সংবাদ বা মিথ্যা ভাষণ স্থান পেত না। তিনি একজন খাঁটি সম্পাদক ছিলেন। প্রথমে ইহার জন্য তাঁর বহু অর্থ লোকসান হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত আহার বিষয়ক প্রবন্ধগুলি Guide to Health নামক পুস্তকাকারে ছাপা হয়।

এই সময় মিঃ ওয়েষ্ট, মিঃ পোলক, মিঃ কেলেমবেক গান্ধীজীর খুব ভক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁর সকল আন্দোলনের সঙ্গী হন। তাঁরা বিদেশী হইলেও গান্ধীজীর পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করেন।

রাসকিনের প্রভাব—একবার জোহানেসবার্গ হতে ডারবানে যাবার সময় মিঃ পোলক "অনটু দিস লাষ্ট" নামক পুস্তকখানি তাঁকে পড়তে দেন। ইহা বিশ্ববিখ্যাত লেখক রাসকিনের লেখা। পুস্তকখানি তিনিও ট্রেনেই পড়ে ফেলেন। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু তাঁকে মুগ্ধ করে এবং তাঁর জীবনে এক বিপ্লব আনে। তিনি এতদিন যাহা অনুভব করে এসেছিলেন এই পুস্তকে তিনি তার সন্ধান পেলেন। তাঁর অন্তরের সুপ্ত ভাবকে এই পুস্তকই জাগ্রত করে। পুস্তকের উপদেশ এইরূপ:—(ক) সকলের মঙ্গলে আমার মঙ্গল, (খ) সমাজে সকলের মূল্য এক রকম কারণ সকলের বেঁচে থাকার প্রয়োজন একই রকম, (গ) মজুর ও কৃষকের জীবনই হল খাঁটি। তৃতীয় উপদেশই তাঁকে বেশী অভিভূত করে। সমস্ত রাত চিন্তা করে ভোর হতেই তিনি রাসকিনের নির্দেশ অনুসারে ও টলষ্টয়ের অনুকরণে সরল জীবন যাপন আরম্ভ করলেন। (গুজরাটি ও হিন্দীতে ইহার অনুবাদ বেরিয়েছে, নাম 'সর্বোদয়')।

কৃষি-উপনিবেশে নূতন জীবন—ডারবানে এসে মিঃ ওয়েষ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে ডারবান হতে তের মাইল দূরে ফিনিক্স নামক গ্রামে একশ একর জমি খরিদ করে কৃষি-কলোনির পত্তন করেন এবং সেখানে সরল ও আদর্শ জীবন যাপন আরম্ভ করেন। তিনি ঋষি ফ্রান্সিসের মত দারিদ্র্যকে বরণ করে নেন। এই জমি ঘাস ও সাপে পূর্ণ ছিল। সব পরিষ্কার করে চালা ঘর তোলা হল। সেখানে প্রচুর ফলের গাছ ছিল। অনেক ভারতীয় মিস্ত্রী ও শ্রমিক দারিদ্র্যের শপথ গ্রহণ করে এই উপনিবেশে বাস করতে এলেন। ইহাতে সহরের কল-কারখানা অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হ'ল। এই হল তাঁর

প্রথম অহিংস সংগ্রাম ও অসহযোগ আন্দোলন। তিনি সকলকে নির্বিরোধিতার মন্ত্র শেখান। স্বর্গীয় মগন লাল গান্ধী তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত শক্তি, বুদ্ধি, ত্যাগ ও শ্রদ্ধা দিয়ে গান্ধীজীর সকল কাজের সঙ্গী ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ এই উপনিবেশ ও পত্রিকাখানি চলে। কিছু দিন পরে তিনি জোহানেস্‌বার্গে ফেরেন এবং মিঃ পোলক ফিনিক্সে কার্য্যের ভার নেন। তিনি সর্বোদয়ের আদর্শে জীবন ও গৃহস্থালী চালাতে আরম্ভ করলেন। সব বিষয়ে সরল ও সাদাসিদে ভাব আনা হ'ল। সব কাজ নিজের হাতে করবার চেষ্টা বাড়ল। জাঁতা কিনে বাড়ীতে ময়দা পেষা পর্যন্ত চলল।

ছেলেদের শিক্ষা—বাড়ীর সকলেই মায় ছেলেরাও নিজেরাই পায়খানা পরিষ্কার করত এবং অসুখ-বিসুখে আনন্দের সঙ্গে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করত। ছেলেদের চরিত্র ও জীবন তিনি নিজের আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং সে বিষয়ে কোন ক্রটি করেন নি। কিন্তু তাদের আক্ষরিক শিক্ষার দিকে তিনি দৃষ্টি দিতে সময় পেতেন না। তাঁর চেষ্টা স্বত্বেও তাদের কেতাবি বিদ্যা ভালভাবে শিক্ষা হয় নি। তিনি প্রত্যহ হেঁটে বাড়ী হতে আড়াই মাইল দূরে অফিস যেতেন এবং সঙ্গে ছেলেদেরও নিয়ে যেতেন। অফিসে ছেলেরা যা একটু আধটু পড়ত। বড় ছেলে হীরালাল দেশে থাকত। কেতাবি বিদ্যা না শেখার জন্য ছেলেরা বিশেষতঃ বড় ছেলে তাঁকে অনেক কথা শুনিয়েছিল। জনসেবার জন্য ছেলেদের প্রতি এই অবহেলা করতে তিনি বাধ্য হন। তাঁর অভিমত ছিল—"সন্তান মাতাপিতার আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতিও পায়। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে প্রকৃতির কিছু তারতম্য হয় কিন্তু মা-বাপের কাছ থেকে যা আসে সেইটেই মূল পুঁজি। ছেলেদের যদি কোন দুর্বলতা এসে থাকে ত সে আমার ও আমার স্ত্রীর দুর্বলতার প্রতিবিম্ব মাত্র। অবশ্য অনেক ছেলে পৈতৃক দুর্বলতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে নেয়।"

জুলু বিদ্রোহ—১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জোহানেস্‌বার্গে প্লেগ মহামারীর সময় গান্ধীজী একটি হাঁসপাতাল স্থাপন করে অপূর্ব কুশলতার সহিত সেবাকার্য করেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর উপর খুব প্রীত হয় কিন্তু সে প্রীতি সাময়িক। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নেটালে জুলু বিদ্রোহ হয়। আসলে ইহা খাজনা বন্ধের আন্দোলন মাত্র, বিদ্রোহের কোন চিহ্ন ছিল না। গান্ধীজী একদল শুশ্রূষাকারী গঠন করে ছয় সপ্তাহ সরকারকে সাহায্য করেন। জুলু ভাইদের সেবা করতে পেয়ে তিনি খুব আনন্দিত হ'ন। ইংরাজরা জুলুদিগকে অনর্থক গুলি করত। আবার আহত জুলুদিগকে কোন ইংরাজ সেবা করত না। গান্ধীজীর সেবা দল না থাকলে ইহাদের চরম দুর্দশা হ'ত। গান্ধীজী যখনই রাষ্ট্রের বিপদ দেখেছিলেন তখনই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ রেখে রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

নূতন জীবন—জুলুদিগের সেবা করবার সময় গান্ধীজীকে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে বাস করতে হত। এই সময় তাঁর মন নানা চিন্তায় ডুবে থাকত। তিনি এই সময় ব্রহ্মচর্য পালনের কথা তীব্রভাবে অনুভব করলেন। এই বিষয়ে তাঁর নিজের অমূল্য কথা উদ্ধৃত করলাম—"ঈশ্বর লাভের জন্য ও নিষ্কাম সেবাকার্যের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন একান্ত দরকার। ভোগ-লালসার তৃপ্তি সাধন ও সন্তানোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সেবাকার্য করা দুষ্কর। এক সঙ্গে দুই ঘোড়ার সওয়ার হওয়া যায় না। এখন আমার স্ত্রী যদি গর্ভবতী হতেন ত আমি জুলুদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারতাম না। বিবাহিত হয়েও ব্রহ্মচর্য পালন করলে সেবা ধর্মের ক্রটি হয় না। এই সময় জুলু বিদ্রোহ বন্ধ হ'ল। আমরা বাড়ী এলাম। আমি ব্রত নিলাম, **মৃত্যু পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করব**। তখন আমার বয়স ৩৭ বৎসর। তখন ঐ ব্রতের মর্ম সম্যক বুঝি নাই। ব্রত-রক্ষা যে কত কঠিন তা এখন বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্রতের

মহত্বও প্রতিদিন অধিক মাত্রায় বুঝতে পারছি। আমার মনে হয় ব্রহ্মচর্যহীন জীবন শুষ্ক ও পশুবৎ। আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম, যে কাজে সংযম ভঙ্গ হয় তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করব। ব্রতের বিরুদ্ধে কোন যুক্তির বশীভূত হলাম না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূপ দুর্গে আশ্রয় নিয়ে মানুষ ভয়ঙ্কর মোহ ও প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচে। উহা আমাদের দুর্বলতা ও চাঞ্চল্যের অমোঘ ঔষধ। 'ত্যাগ নাই টেকে ভাই বৈরাগ্য যদি না থাকে।' সাধক-অবস্থায় মোহ ও বিকারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কবচ হ'ল এই ব্রতই। আমার স্ত্রী কোন আপত্তি করেন নাই। আমি ক্রমেই সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। অতীতের সমস্ত কাজ আমাকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করছিল। ব্রহ্মচর্য-ব্রত মনে শান্তি দান করছিল। এই বুড়ো বয়সেও মনে করি এ কাজ কত কঠিন। এ ব্রত পালন করা ধারাল তলোয়ারের উপর দিয়া চলার মত কঠিন। প্রতি পলে সতর্ক ও জাগ্রত হতে হয়। ব্রহ্মচর্যের অর্থ হচ্ছে **চিন্তায়, কথায় ও কাজে ইন্দ্রিয়-সংযম**: ব্রহ্মচারীর ও ভোগীর দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক পার্থক্য। ব্রহ্মচারী ঈশ্বর প্রীত্যর্থে সব কাজ করেন। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে নিরন্তর চেষ্টা করলে সব কাজে সফলকাম হওয়া যায়।" গান্ধীজী খাদ্যের সহিত সংযমের নিকট সম্পর্ক এবং স্বাস্থ্যের ও ধর্মের দিক দিয়া অনশনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর জীবনে এক অপূর্ব সমন্বয় হয়। তিনি একাধারে উপার্জনক্ষম ব্যারিষ্টার, সমাজসেবক, শুশ্রূষাকারী, স্বভাব-চিকিৎসক, রাজনীতিক, কৃষক, ব্রহ্মচারী-সংসারী, সম্পাদক ও স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন।

গৃহে সত্যাগ্রহ—একবার কস্তুরীবাইএর খুব রক্তস্রাব হয়। জল-চিকিৎসায় কোন উপকার না পেয়ে গান্ধীজী তাঁকে ডাল ও লবণ খাওয়া ছাড়তে বললেন। কস্তুরীবাই অসম্মতি জানিয়ে উত্তর দেন, "তোমাকে

যদি ডাক্তার লবণ ও ডাল ছাড়তে বলেন তুমিও হয়ত রাজি হবে না।" এই কথায় গান্ধীজী মনে আঘাত পেলেন এবং আত্ম-পরীক্ষার পরম সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, "ভুল বুঝেছ, ডাক্তার পরামর্শ দিলে আমি নিশ্চয়ই ছাড়তাম। আচ্ছা তুমি ছাড় আর না ছাড় আমি তোমার জন্য এক বৎসর লবণ ও ডাল ছাড়লাম।" কস্তুরীবাই কাতরকণ্ঠে বললেন, "দোহাই তোমার, তোমার স্বভাব জানা সত্ত্বেও কথাটা বলে ফেলেছি, আমি আজই লবণ ডাল ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও।" গান্ধীজী বললেন, "সেজন্য তুমি চিন্তা করো না। আমি লবণ ডাল না খেয়ে থাকতে পারব। তুমিও মনে বল পাবে।" এই ঘটনার পর গান্ধীজী প্রায় দশ বৎসর লবণ ও ডাল গ্রহণ করেন নাই। ইহার পর কস্তুরীবাই-এর রক্তঃস্রাব বন্ধ হয়, স্বাস্থ্যও ফিরে আসে। বৈদ্য হিসাবে তাঁর হাতযশ বেড়ে যায়। গান্ধীজী একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। তিনি জল ও মাটির দ্বারা স্বভাব-চিকিৎসার (Nature cure) উপর বেশী নির্ভর করতেন।

আইনজ্ঞ গান্ধীজী—ব্যবহারজীবি হিসাবে গান্ধীজী খুব বেশী খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারেন নি। প্রথমতঃ তিনি প্রথম জীবনে অত্যন্ত লাজুক ছিলেন, তারপর তাঁর পসার যখন বাড়তির মুখে সেই সময় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস সংগ্রামে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি শুনেছিলেন, মিথ্যা কথা না বললে ভাল উকিল হওয়া যায় না কিন্তু সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর মিথ্যার আশ্রয় লইয়া অর্থোপার্জন করা বা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার আকাঙ্খা কোন দিনই হয় নি। ওকালতির অর্থ জন সেবাতেই ব্যয় হ'ত। হাত-খরচ বাবদ কখন কিছু নিতেন। তিনি পূর্বেই মক্কেলকে সাবধান কর দিতেন, "যদি মোকদ্দমা মিথ্যা হয় ত আমার কাছে এসো না। সাক্ষী শিখানোর আশা আমার কাছে করো না।"

তিনি বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকালতির সময় আমি একবারও মিথ্যা বলেছি মনে হয় না।" জোহান্সেবার্গে এক মামলা পরিচালনার সময় যখন তিনি বুঝতে পারেন যে মক্কেল তাঁকে ধোকা দিয়েছে তখন তিনি হাকিমকে বল্লেন "এই মামলা খারিজ করে দিন।" আদালতে সকলে বিস্মিত হয়ে গেল। এই ঘটনার প্রভাব অন্য উকিলদের উপর বিস্তৃত হয়েছিল। জনসেবায় গান্ধীজির সহকর্মী রুস্তমজী একবার খুব বিপদে পড়েন। তিনি গোপনে বিনাশুল্কে বোম্বাই হইতে মাল আমদানি করতেন। এই চুরি একবার ধরা পড়ে যায়। রুস্তমজী গান্ধীজীকে ধরলেন "আমাকে এবারে বাঁচাও।" গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে তিনি হাকিমের কাছে অকপটে দোষ স্বীকার করাতে সামান্য কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে নিষ্কৃতি পান। গান্ধীজীর উপদেশমত এই চুরির বিবরণ লিখে আয়নায় বাঁধিয়ে তিনি নিজের অফিসে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। আইনজীবিদের ইতিহাসে এইরূপ সত্যাশ্রয়ী আইনজ্ঞের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

নেতাদের প্রভাব—দুইজন ভারতীয় নেতা দাদাভাই নৌরেজী (পার্শি) ও গোখলে গান্ধীজীর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ইহারা উভয়েই ধর্ম্মমিশ্রিত দেশ-প্রেমে মেতে উঠেছিলেন। গোখলে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক। দাদাভাই ভারতীয় জাতীয়তার প্রবর্তক। দাদাভাই গান্ধীজীকে রাজনীতিতে অহিংসার প্রবর্তনের প্রথম পাঠ দেন এবং প্রেমের দ্বারা অমঙ্গলের প্রতিরোধ করা শিক্ষা দেন।

সত্যাগ্রহের জন্ম—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২২ শে আগষ্টে এসিয়াটিক অর্ডিনান্সের ঘাতকী আইনের খসড়া ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই অর্ডিন্যান্সের মর্ম ছিল—আট বা ততোধিক বয়সের ভারতীয় নরনারীকে শারীরিক চিহ্ন ও দস্তখত দিয়ে দোষী আসামীর মত ট্রান্সভালে নাম রেজিষ্ট্রি করতে হবে। নচেৎ জেল জরিমানা হবে।

বেরেজেষ্টারি লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন সুরু হ'ল। গান্ধীজী বিলাতে গিয়াও মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ১১ই সেপ্টেম্বরে একটি জনসভা আহূত হ'ল। প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল—এই বিলের আইনে পরিণতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অহিংস উপায় অবলম্বন করা হবে। যদি বিল আইনে পরিণত হয় ত ভারতীয় তাহা অমান্য করে কারাবরণ করবে। এই আন্দোলনের প্রথমে নাম রাখা হয় **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ** (Passive Resistance)। পরে ইহার নাম রাখা হয় **সত্যাগ্রহ** (কারণ পরে বলা হয়েছে)। এই সব আন্দোলন স্বত্বেও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২১শে মার্চ বিল পাশ হয়।

চারিদিকে নাম রেজেষ্টারি বন্ধ করার জন্য পিকেটিং আরম্ভ হ'ল। তৎসত্বেও অনধিক পঞ্চাশ জন ভারতীয় নাম রেজেষ্টারি করল। চারিদিকে সরকারের উৎপীড়ন চলতে লাগল। পিকেটারদের ধরে জেলে আটক রাখা হ'ল। রামসুন্দর নামে একটা লোক বাহাদুরীর জন্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক মাস কারাবাস ভোগ করার পর ট্রান্সভাল ও আন্দোলন ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই ব্যাপারে গান্ধীজী শিক্ষা পান যে প্রত্যেক আন্দোলন খাঁটি লোক নিয়ে আরম্ভ করা উচিৎ। Indian Opinion এ আন্দোলন সম্পর্কে সত্য কথা প্রকাশিত হ'ত। কর্তৃপক্ষ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কয়েকজন নেতাদের উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রান্সভাল ত্যাগ করবার জন্য নোটিশ জারি করেন। নেতারা সেই আদেশ অমান্য করলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী এই অপরাধে গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা দু'মাস করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। ইহাই গান্ধীজীর প্রথম কারাদণ্ড। আদালতে ওকালতি করার চেয়ে গান্ধীজী রাজনৈতিক অপরাধী হয়ে দাঁড়ান অধিক সম্মানজনক মনে করলেন। কয়েদীদিগকে জোহান্সেবার্গে একটি বড়

ঘরে অবরুদ্ধ রাখা হ'ল। এই ঘরে ছাদের কাছে মাত্র একটি ছোট জানালা ছিল। দিন দিন জেলখানায় সত্যাগ্রহীর সংখ্যা বেড়ে চলল। যতই দলে দলে লোক আন্দোলনে যোগদান করে ততই তাদের দণ্ড কঠোরতর হ'তে লাগল। জেলে অল্প ও জঘন্য খাদ্য দেওয়া হ'ত। এই অপূর্ব অহিংস যুদ্ধের নূতনত্বে, কৌশলে ও চমৎকারিত্বে দুনিয়া বিস্মিত হয়ে গেল।

আপোষ—ইতিমধ্যে সরকারের সঙ্গে একটা আপোষ হ'ল। সর্ত হ'ল—যদি ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় রেজেষ্ট্রি পরোয়ানা নেয় তবে বিতাড়ন-আইন উঠে যাবে এবং কয়েদীরা নিষ্কৃতি পাবে। সত্যাগ্রহীর নীতি সবাইকে বিশ্বাস করা। সত্যাগ্রহী হিসাবে গান্ধীজী এই সর্তে সম্মতি দিলেন। তিনি সকলকে বুঝিয়ে সম্মত করালেন কেবল দু'জন পাঠান মীর আলম ও তার বন্ধু আঙ্গুলের ছাপ দিতে কিছুতেই সম্মত হ'ল না। মীর আলম গান্ধীজীর প্রতি খুব রুষ্ট হয়। গান্ধীজী যখন প্রথম এশিয়াটিক অফিসে পরোয়ানা নিতে যান পথিমধ্যে গান্ধীজীকে মীর আলম ও তার বন্ধু লাঠি দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে। পুলিস তাদের গ্রেপ্তার করে। তিনি অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে পরোয়ানা পরে নিতে বলায় তিনি তদুত্তরে বলেন, "তা হবে না, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বেঁচে থাকলে আমিই আগে পরোয়ানা নেব।" তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালনে বরাবরই একটা ঐকান্তিক জিদ্ ছিল তা সে যত সামান্য প্রতিজ্ঞা হ'ক না কেন। গান্ধীজী সুস্থ হয়ে মীর আলমকে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারী উকিলের নিকট তার করেন, কিন্তু সাহেবদের জিদে তাদের ছয় মাসের সাজা হয়। গান্ধীজীকে রেভারেণ্ড ডোকের বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করা হয়। এই সম্পর্কে সত্যাগ্রহ অফিসে গান্ধীজী এক পত্র দেন—"মিঃ ও মিসেস ডোক আমার সেবায় প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। আক্রমণকারীর উপর আমার কোন আক্রোশ নাই। তারা অজ্ঞতার

জন্য এইরূপ দুষ্কার্য করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হবে না। এই ঘটনায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়ার পরিবর্তে প্রেম যেন বর্ধিত হয় এই আমার প্রার্থনা। সরকারের উপর বিশ্বাস করে সকলে যেন দশটা আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা লয়। এতেই আমাদের কল্যাণ হবে। আমরা যদি প্রকৃত সত্যাগ্রহী হই তবে অত্যাচারের ভয়ে দমিত হব না।"

সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ—সর্তানুযায়ী ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে পরোয়ানা নিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ সর্তানুযায়ী ঘাতকী আইন রদ করলেন না উপরন্তু পরোয়ানা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হ'ল। জেনারেল স্মাট্‌স গান্ধীজীর পত্রের কোন উত্তরই দিলেন না। ট্রান্সভাল সরকার উত্তরে স্পষ্টই জানালেন যে তাঁরা ঘাতকী আইন রদ করবেন না। একটি বিরাট সভা করে ইহার প্রতিবাদ জানান হয় এবং দু'হাজার পরোয়ানা একত্র করে অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা হয়। অগ্নিশিখা যখন উপরে উঠতে থাকে তখন সত্যাগ্রহীদের কি অপূর্ব উন্মাদনা! কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে দ্বিতীয় এশিয়াটিক বিল মঞ্জুর করান। এই একই অধিবেশনে Immigrants Restriction Bill নামক নূতন এক আইন পাশ করা হয়। প্রতিশ্রুতি ত পালিত হ'ল না উপরন্তু দ্বিতীয় আইনে যাহাতে কোন নূতন ভারতবাসী ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা হ'ল। গোদের উপব বিষ গোড়া।

দ্বিতীয় বার সত্যাগ্রহ—এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্বুরু হ'ল। ট্রান্সভালের অধিবাসীরা নেটালের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগদান করল। দলে দলে লোক কারাবরণ করতে লাগল। একি এক অভূতপূর্ব জাগরণ! আত্মসম্মান রক্ষার জন্য পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির এক অদ্ভুত সংগ্রাম! কারাগার ভর্তি হয়ে গেল,

আর স্থান সংকুলান হয় না। তখন জোরপূর্ব্বক ভারতীয়দের দেশে পাঠানর ব্যবস্থা হ'ল। সরকার পক্ষের নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিকার করার এই অভিনব অহিংস সংগ্রাম দেখে সকলেই বিস্মিত হ'ল। প্রতিরোধকারীদের হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই, কোন বলপ্রকাশ নাই, নির্বিবাদে আইন অমান্য করে কারাবরণ। হিংসার পূজারী ইংরাজ আত্মিক সংগ্রামের মহিমা কি বুঝবে! শত অত্যাচার, শত লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করে ভারতবাসীরা অহিংসা লড়াই চালিয়ে গেল।

টলষ্টয় আশ্রম—মহা বিপদ হ'ল কয়েদীর পরিবারবর্গকে নিয়ে। তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেতাদের উপর পড়ল। আশ্চর্য্য, এই আন্দোলনে অনেক ইংরাজও গান্ধীজীকে সাহায্য করলেন। সৎলোক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। মিঃ কেলেমবেক গান্ধীজীকে ১১০০ একর ভূখণ্ড দান করলেন। এই ভূখণ্ড ছিল জাহান্সেবার্গ থেকে ২১ মাইল দূরে। এখানে বহু গাছপালা, একটি ঝরণা ছিল। অমনি বিপুল উৎসাহে আরম্ভ হয়ে গেল এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আশ্রম গঠন। আশ্রম-বাসীরা নিজেরাই ঘর তৈরি, চাষবাস, গৃহস্থালির কর্ম করতে লাগল। আত্মনির্ভরতার জন্য প্রত্যেক বাসিন্দাকে পায়খানা পরিষ্কার করা থেকে রান্না পর্যন্ত স্বহস্তে করতে হ'ত। স্ত্রী-পুরুষ থাকার পৃথক ঘর ছিল। এই আশ্রমে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী নির্বিবাদে শান্তিতে বাস করত। কাহাকেও কোন রকম বাজে খরচ করতে দেওয়া হ'ত না। পাঠশালা, ছোটখাট কাঠের ও জুতার কারখানা, হাঁসপাতাল চালান হ'ত। জুতার কারখানায় গান্ধীজী নিজ হাতে কয়েক ডজন চপ্পল (স্যাণ্ডাল) তৈরী করেন। মিঃ কেলেমবেক তাঁদের জুতা তৈরী শিখান। কাঠের কারখানায় বেঞ্চ থেকে সিন্দুক পর্য্যন্ত তৈরী হ'ত। পাঠশালায় গান্ধীজী ও মিঃ কেলেমবেক পড়াতেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

ছাত্ররা পরস্পরের ধর্মের ও আচার-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে, শিষ্টাচারী ও উদ্যমী হতে শিখত। মিঃ কেলেমবেক গান্ধীজীর নিজের ছেলেদের নিকট হতে দুষ্ট ছেলেদের পৃথক করতে চাইলে গান্ধীজী যুক্তি দেখিয়ে বলেন, "দুষ্ট ছেলেদের আমি বিদায় করতে পারি নে। এইরূপ মেলা মেশার ফলে ভাল ছেলেদের ভালটুকু মন্দ ছেলেদের মধ্যে সংক্রামিত হবে, এবং ভাল ছেলেরা মন্দ ভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখবে। ভাল-মন্দর মাঝখানে পড়লে বিচার শক্তি বাড়ে। তা ছাড়া পৃথক করে দিলে আমার ছেলেদের আত্মাভিমান বাড়বে। একসঙ্গে থাকলে আমার ছেলেদের কোন বড় মানুষি ভাব থাকবে না। তবে এই বিষয়ে অভিভাবকদের সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। ছেলেদের মানুষ করা যে কত কঠিন তা এখন বুঝতে পারছি।"

প্রথম অনশন—সত্যাগ্রহীরা জেল থেকে মুক্তি লাভ করলে আশ্রমের অনেকে স্বগৃহে চলে যায়। আশ্রমটি ফিনিক্সে স্থানান্তরিত করা হয়। গান্ধীজী নিজে জোহান্সেবার্গে গেলেন। কিছুদিন পরে দু'জন আশ্রমবাসীর নৈতিক অধঃপতনের সংবাদে তিনি বজ্রাহত হন। তিনি মনে করলেন, "যাহারা আমাদের রক্ষণাধীন তাদের দোষ-ত্রুটির জন্য আমরাই দায়ী।" তিনি স্বভাবতই বিশ্বাসশীল ছিলেন সেজন্য এই বিষয়ে অপরের সাবধান বাণীতে কর্ণপাত করেন নাই।

অপরাধীদিগকে দোষের গুরুত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্যে তিনি তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আশ্রমে গিয়ে সাত দিন অনশন এবং সাড়ে চারমাস এক বেলা ভোজন করেন। ইহাতে ক্রোধের পরিবর্তে তাঁর দয়ার সঞ্চার হ'ল। মিঃ কেলেমবাকও গান্ধীজীর সঙ্গে অনশন করেন। এইরূপ অনশনের ফলে আশ্রমের আবহাওয়া পবিত্র হ'ল। সবাই পাপের ভীষণতা বুঝল। এই উপলক্ষে পুনরায় দু'সপ্তাহ তিনি অনশন

করেন। এইরূপ অনশন সম্বন্ধে তিনি বলেন, "শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক থাকলে, ছাত্রের দোষে শিক্ষকের মনে আঘাত লাগলে এবং শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা থাকলে এইরূপ উপবাস উপকারী।"

সত্যাগ্রহে মহিলাদের অংশ—১৯১২ খৃষ্টাব্দে আপোষ-মীমাংসার জন্য গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন। ট্রান্সভালে প্রত্যেক ভারতীয়কে তিন পাউণ্ড কর দিতে হয়। কথা হয় যে শীঘ্রই সব মীমাংসা হবে, তিন পাউণ্ড কর পরের বৎসরে উঠে যাবে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সরকার পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। স্থির হ'ল টলষ্টয় আশ্রমবাসীরা অন্যায় কর উঠাবার জন্য সত্যাগ্রহ করবে। এবার এক নূতন বিপদ দেখা দিল। এক মামলায় বিচারক দক্ষিণ আফ্রিকায় কেবল খৃষ্টধর্ম সম্মত বিবাহই আইন সঙ্গত বলে সিদ্ধান্ত করলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান পার্শী সম্প্রদায়ের বিবাহ আইনত অসিদ্ধ হ'ল এবং তাঁদের ধর্মপত্নীরা রক্ষিতায় পরিণত হ'ল। কাজেই তখন স্ত্রীলোক-দিগকে সত্যাগ্রহ থেকে দূরে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হ'ল না। আশ্রমের মহিলারা খুব উৎসাহ সহকারে সত্যাগ্রহে যোগ দিলেন। স্থির হ'ল, তাঁরা নাটাল ও ট্রান্সভালের মধ্যে বিনা পরোয়ানায় যাতায়াতের আইন ভঙ্গ করবে। যারা মুক্তি পাবে তারা নাটালের কয়লা খনিতে মজুরদের ধর্মঘট করতে প্ররোচিত করবে। ফিনিক্সে তিনি মহিলাদের উৎসাহিত করলেন। আন্দোলনের বিপদের কথা, জেলে কষ্টের কথা, অত্যাচারের কথা সব তাদের বুঝিয়ে বললেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েরা নিজে উৎসাহিত না হ'লে তাদের কথায় সত্যাগ্রহ করলে হয়ত শেষে আদালতে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি ভিক্ষা করবে, আন্দোলনও শিথিল হবে। তিনি সকলকে বুঝিয়ে দেন, "কোন বিপদেই পিছু হটলে চলবে না, যা ভাববার দরকার আগে ভাব। সত্যাগ্রহে যোগ না দিলে লজ্জা নাই,

কিন্তু যোগ দিয়ে পালালে লজ্জার সীমা নাই।" অনেক মহিলা কয়লাখনিতে ধর্মঘট ঘটাল। এই সব মহিলাদের তিনমাস করে কারাদণ্ড হয়। কস্তুরীবাই স্বেচ্ছায় এই সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরও তিন মাস কারাদণ্ড হয়। মহিলাদের কারাগারে আহারের অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হ'ত। কস্তুরীবাই অস্থিকঙ্কালসার হয়ে মুক্তি পান। বালি আম্বা নামক একটি বালিকা ভয়ানক জ্বর নিয়ে বাহিরে এসে মারা যায়। গান্ধীজী একদিন রুগ্নশয্যায় আম্বাকে জিজ্ঞাসা করেন, "জেলে যাওয়ার জন্য তোমার আপশোস হচ্ছে না ত?" "কেন হবে, আবার গ্রেপ্তার করে ত আবার জেলে যাব।" "যদি সেখানে মরে যাও তবে?" "ভালই হবে, দেশের জন্য মরতে কার না সাধ হয়?" এই সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন, "এই সকল ভগ্নিদের ত্যাগ ছিল শুদ্ধ, সাত্বিক। এঁদের আত্মদানে ভগবানের আসন টলে যায়। অনেকের কারাবাসে হয়ত কোন ফল হয় না কিন্তু একটি শুদ্ধাত্মা ব্যক্তির আত্মসমর্পণ কখনো ব্যর্থ যায় না। বালি আম্বার বলিদান নিশ্চয়ই সফল হয়েছে। হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর মধ্যে যদি একজনও শুদ্ধাত্মা থাকে তাঁর যজ্ঞই কার্যসফলতার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবী সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে।"

নেটাল-ট্রান্সভাল অভিযান ; সত্যাগ্রহে শ্রমিকের অংশ— মহিলাদের সত্যাগ্রহ শ্রমিকদের উৎসাহিত করল। নাটালের অন্তর্গত নিউক্যাসেলের কয়লাখনির শ্রমিকরা দলে দলে কাজ ছেড়ে দিল। তাদের বাড়ীর আলো, জল বন্ধ হ'ল, জিনিষপত্র ভেঙ্গে তছনছ করা হ'ল, মারধরও করা হ'ল। একজন পাঠান বল্লে, "গান্ধীজী, পাঠান কখনও মার খায় না, মার দেয়। আপনার খাতিরেই মার খেয়ে কিছু করিনি।" গান্ধীজী বললেন, "ভাই তোমার আহিংস শক্তিতেই আমি সংগ্রামে জয়লাভ করব।" এই সর্বহারা মজুররা দলে দলে সব নিউক্যাসেল সহরে এসে জমা

হ'ল। গান্ধীজী তাদের নিয়ে নেটাল হতে ট্রান্সভালে বিনা পরোয়ানায় গিয়ে আইন ভঙ্গ করে কারাবরণ করবার সংকল্প করলেন। তিনি খনি-মালিকদের সঙ্গে আপোষের শেষ চেষ্টাও করলেন। সত্যাগ্রহী গান্ধীজী আপোষের শেষ চেষ্টা না করে কোন আন্দোলন আরম্ভ করেন না। শ্রমিকদের তিনি বললেন, "মালিকদের ধমকানি, ভবিষ্যতের বিপদ, জেল প্রভৃতি ভয় করলে চলবে না। যারা কাজ করে যেতে চাও, যাও, একবার এগোলে আর ফেরার রাস্তা নেই। পথে রোজ তিন পোয়া রুটি ও একটু চিনি ছাড়া কিছু মিলবে না। প্রয়োজনের বেশী কাপড় চোপড় লওয়া চলবে না। পথে অন্য কাহারও জিনিষে হাত দিতে পারবে না। অন্যে মারলে বা গাল দিলে সব নির্বিবাদে সহ্য করতে হবে। গ্রেপ্তারে কেহ কোন বাধা দিতে পারবে না। আমি গ্রেপ্তার হলে শান্তি-পূর্ণভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।" পাঁচ ছয় হাজার শ্রমিকের অভিযান চার্লসটাউন পর্যন্ত নিরাপদে পৌছল। সেখানে বণিকরা অভিযাত্রীদের অনেক সাহায্য করল। সব কাজে-ঘর ঝাট দেওয়া, মলমূত্র পরিষ্কার করা নেতারাই অগ্রণী হতেন, অন্য সকলে তাঁদের অনুসরণ করত। এ বিষয়ে গান্ধীজী বলেন, "নেতা যদি সব কাজ নিজ হাতে করে দেখান তাহলে অনুগামীরা তাঁকে অনুসরণ না করে থাকতে পারে না। আর নেতা চুপচাপ বসে হুকুম দিলে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয় না।" রান্না ও পরিবেশন দুইই গান্ধীজী তদারক করতেন, ফলে খাদ্য কখনও কাঁচা থাকত, কখনও পরিমাণে কম হত। ইহাতে সকলে আনন্দ উপভোগ করত। চার্লসটাউন থেকে গান্ধীজী কর্তৃপক্ষকে জানান, "সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে আমরা ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে চাই। আমাদিগকে এখনই গ্রেপ্তার করতে পারেন। যদি মাথাপিছু তিন পাউণ্ড কর তুলিয়া দেন শ্রমিকরা কার্যে ফিরে যাবে।" ইহার কোন

উত্তর এল না। টেলিফোনে জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে কথা বলার গান্ধীজীর শেষ চেষ্টার উত্তর এল, "জেনারেল আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।" ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর প্রাতে প্রার্থনান্তে যাত্রা সুরু হ'ল।

এই বিরাট অভিযানে হিন্দু মুসলমান পার্শী খৃষ্টান সকলেই স্বেচ্ছায় যোগ দিল। পথিমধ্যে বহু লোক এমনকি গোরারা পর্য্যন্ত অভিযানকে সাহায্য করল। ২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোক ও ৫৭টি শিশু নিয়ে এই অভিযান গঠিত হয়েছিল। ট্রান্সভালের সীমানার এক মাইল দূরে পৌছতেই পুলিশ জনতাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল। বাধা না মেনে অভিযাত্রী দল পামফোর্ডে সন্ধ্যায় পৌছল; সেখানে রাত্রিতে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ৫০ পাউণ্ডের জামিনে মুক্তি পেয়ে পুনরায় সঙ্গীদের সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথিমধ্যে গান্ধীজীকে আরও তুইবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ১০ই তারিখে সমস্ত অভিযাত্রীদিগকে গ্রেপ্তার করে তিনটি ট্রেণে নাটালে পাঠান হল। সেখানে কয়লাখনির আশেপাশে জেলখানা তৈরি করে শ্রমিকদের আবদ্ধ রাখা হত এবং খনিতে জোরপূর্ব্বক কাজ করান হত। এইরূপ Forced Labour এর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন সুরু হল। জনমতের চাপে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কার্যের প্রতিবাদ করে একটি বিখ্যাত বক্তৃতা দেন। শেষে Royal Commission বসে। কমিশনের রিপোর্টের ফলে Indian Relief Bill পাশ হয় এবং তিন পাউণ্ড করও উঠে যায়। অন্য ধর্ম্মসম্মত বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ হয়; ভারতীয়দের পরোয়ানা-গ্রহণ রদ হয়। গান্ধীজীকে ডাণ্ডির আদালতে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। মিঃ পোলক ও মিঃ কেলেমবেক তিন মাস করে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

সত্যাগ্রহের জয়—বিশ বৎসর অক্লান্ত সাধনার পর অশেষ লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ করে অসীম ত্যাগ স্বীকার করে এবং আট বৎসর অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ জয়লাভ করল। গান্ধীজী অহিংসার মন্ত্রে অধিকতর বিশ্বাসী হলেন। এই কয়েক বৎসর গান্ধীজী দেশসেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে এক অভিনব আধ্যাত্মিক প্রণালীতে গঠন করেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলেন যে আন্দোলন যদি সত্যবর্জ্জিত হয় তবে তাহা কখনই সফল হবে না। তাই তিনি সকল কাজে সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করতে শিক্ষা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আন্দোলন পরিচালনায় যে আত্মিক শক্তি, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করলেন তাই বিশ বৎসর ব্যাপী ভারতের বিরাট স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে পরিচালনায় বিশেষ কাজে আসে।

দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে নিজেদের দোষ-ত্রুটি থাকলে তাহা অকপটে স্বীকার করতেন। ইউরোপীয়দের যুক্তি তর্কে ন্যায্য কথা থাকলে তাহা সম্মান করতেন। সরকারের সঙ্গে সম্মানজনক সর্তে সহযোগিতার সুযোগ কখনও তিনি নষ্ট করতেন না। এই আন্দোলনে বহু ইউরোপীয়ানের সহানুভূতি ছিল; বিরোধী কাগজে আন্দোলনের সমস্ত সংবাদ সম্পূর্ণভাবে ছাপা হ'ত। অনেক লক্ষপতি ইংরাজ এই আন্দোলনকে সাহায্য করেন।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সত্যাগ্রহ—গান্ধীজী প্রথমে এই নূতন আন্দোলনকে Passive Resistance নামে অভিহিত করেন। তখন তিনি ইহার মর্ম বুঝতে পারেন নি। আন্দোলন যতই বাড়তে লাগল নাম লইয়া ততই গোল বাধল। তিনি এই মহাপ্রয়াসকে বিজাতীয় নামে অভিহিত করতে লজ্জাবোধ করলেন। সর্বাপেক্ষা ভাল নামের জন্য তিনি পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি Indian Opinionএ এই অহিংস

যুদ্ধের রহস্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। অনেক নাম এল। তিনি মগনলালের দেয়া নাম 'সদাগ্রহ' পছন্দ করলেন কারণ এই আন্দোলন **সৎ** বা **শুভ** আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'সত্যের' মধ্যে শান্তিরও সমাবেশ আছে এবং কোনও বস্তুর আগ্রহ করলে তাতে বলও উৎপন্ন হয়। সেইজন্য **'সৎ'** এর পরিবর্তে **'সত্য'** কথাটা পছন্দ করলেন। শান্তি হতে উৎপন্ন বল হ'ল **সত্যাগ্রহ**।

ইংরাজরা Passive Resistance কে যারা দুর্বল, যাদের মতাধিকার নাই, যারা সংখ্যায় কম তাদের অস্ত্র বলে মনে করেন। সেইজন্য গান্ধীজী সত্যাগ্রহ ও Passive Resistance এর পার্থক্য বুঝিয়ে দেন—"Passive Resistanceএ প্রেমভাবের স্থান নাই, সত্যাগ্রহে বৈরভাবের স্থান নাই, বরঞ্চ বৈরভাব পোষণ করা সত্যাগ্রহে অধর্ম। Passive Resistanceএ যদি সুবিধা হয় তবে অস্ত্রবল প্রয়োগ করা চলে। সত্যাগ্রহে যদি অস্ত্রপ্রয়োগের উত্তম অবকাশও উপস্থিত হয় তবুও তাহা সর্বতোভাবেই পরিত্যজ্য। অনেক সময় Passive Resistance অস্ত্রবল প্রয়োগের জন্য প্রস্তুতি করে, সত্যাগ্রহ সেভাবে ব্যবহার করাই যায় না। Passive Resistance পশুবলের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। সত্যাগ্রহ বা আত্মিক বল এবং পশুবল দুইটি পরস্পর বিরোধী। দুই বল একসঙ্গে প্রয়োগ করা যায় না। সত্যাগ্রহ প্রীতিভাজনদের প্রতিও প্রযুক্ত হতে পারে। প্রীতিভাজনকে শত্রু বলে গণ্য না করলে Passive Resistance এর প্রয়োগ করা চলে না। Passive Resistanceএ বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার, যাতনা দেওয়ার অবকাশ আছে, সত্যাগ্রহে বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তামাত্র করারও স্থান নাই। সত্যাগ্রহে নিজে দুঃখ সহ্য করে নিজে দুঃখ বহন করে বিরোধীকে বশীভূত করার ভাব থাকা চাই। এইরূপ উভয় শক্তির মধ্যে মূলগত বৃহৎ প্রভেদ আছে। ভোটা-

ধিকার থাকিলে বেশীর ভাগ স্থানে সত্যাগ্রহের আবশ্যকই হয় না। অস্ত্রবলে বলীয়ানের সত্যাগ্রহ করার অবকাশ কম উপস্থিত হয়। সত্যাগ্রহ আত্মিক বল। যেখানে যে পরিমাণে অস্ত্রবল বা পশুবলের প্রয়োগ সেইখানে সেই পরিমাণে আত্মিক বলের কম প্রয়োগ। আমরা দুর্বল বলে Passive Resistance গ্রহণ করি নাই, তা হলে প্রতিরোধ দ্বারা আমাদের শক্তি বাড়বে না, সুবিধা হইলেই এই দুর্বলের অস্ত্র ফেলে দেব। আমরা সবল বলে সত্যাগ্রহ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। ইহাতে আমরা বলবান এই বিশ্বাসে দিন দিন আমাদের শক্তি বেড়ে যাবে। সত্যাগ্রহ-শক্তি যত বাড়বে ততই ইহা পরিত্যাগ করার পথ খুঁজতে ইচ্ছা হবে না। ভারতীয় আন্দোলনের কোথাও কোন অবস্থাতেই পশুবল প্রয়োগের স্থান নাই। কঠিন দুঃখভোগ করেও সত্যাগ্রহীরা শারীরিক বলপ্রয়োগ করেন নাই। সকল সত্যাগ্রহীই সত্যাগ্রহের বর্ণিত গুণের অধিকারী একথা আমি বলতে চাই না। অনেকেই সত্যাগ্রহের গুণাবলীর সহিত সম্পর্ক রাখেন না, অনেকে আবার সত্যাগ্রহকে দুর্বলের অস্ত্র মনে করেন। Passive Resistance এর দৃষ্টান্ত—Non-Conformist Christian কর্তৃক শিক্ষা-আইনের প্রতিরোধ এবং বিলাতের মহিলা কর্তৃক ভোটাধিকারের জন্য Suffragist আন্দোলন। যীশু খৃষ্টের পর হাজার হাজার খৃষ্টান যে অত্যাচার সহ্য করেছেন তাহা Passive Resistance নামে অভিহিত হলেও তাহা সত্যই সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহ হ'ল 'সক্রিয় প্রতিরোধ প্রেমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা।"

বিলাতে গান্ধীজী—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই গান্ধীজী ভারতের পথে গোখলের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। গোখলে তখন প্যারিসে। সঙ্গে কেলেমবেক ও কস্তুরীবাই ছিলেন। তাঁরা জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন। গান্ধীজী দামী সৌখীন জিনিষ

পছন্দ করতেন না। তাঁদের সাদাসিদে জীবন ধারণের সঙ্গে এ জিনিষের সঙ্গতি ছিল না। কেলেমবেকের দু'একটা দামী দূরবীণ ছিল। ইহা নিয়ে গান্ধীজী ও কেলেমবেকের মধ্যে প্রায় বাদানুবাদ হ'ত। একদিন গান্ধীজী তাঁকে বললেন, "এই জিনিষটা নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে ঝগড়া তখন এটাকে সমুদ্রে ফেলে দিই না কেন?" কেলেমবেক নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, "হাঁ, ঠিক ত? আমার কোন আপত্তি নাই।" গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ সেটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তাঁর নীতির প্রতি এমনই নিষ্ঠা ছিল। তিনি ৬ই আগষ্ট বিলাত পৌছান। তৎপূর্বে ৪ঠা আগষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা—গান্ধীজী ব্রিটিশকে যুদ্ধে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে বিলাতে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক সভা আহ্বান করেন। তিনি ছাত্রদিগকে যুদ্ধে সাধ্যমত সরকারকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমে মনে করতেন—"ইংরাজের শাসন-পদ্ধতি গলদ সত্ত্বেও খুব খারাপ বা অসহ্য নয়। প্রেমের দ্বারা শাসকের দোষ দূর করা যায়। ইংরাজের বিপদের সময় সাহায্য করলে তাঁরা আমাদের রাজনৈতিক সুবিধা দেবে।" (পরে এই মতের পরিবর্ত্তন হয়) তিনি ইংরাজের বিপদের সময় আমাদের দাবি পেশ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি আশীজন ছাত্র নিয়ে একটি Ambulance Corps গঠন করেন। ইহাতে কস্তুরীবাইও যোগ দেন। তাঁরা ছয় সপ্তাহ First Aid শিখলেন। তিনি ধর্ম মনে করে যুদ্ধে যোগ দেন। সহযোগিতার বিষয়ে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি লেখেন, "আমার উনত্রিশ বৎসর রাজনৈতিক জীবনে আমি নিজে ব্রিটিশের সঙ্গে যেরূপ নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করেছি কোন ইংরাজ বুঝি তেমন করে নি। আমি ইংলণ্ডের জন্য চার বার জীবন বিপন্ন করেছি—১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি সর্বান্তঃকরণে ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কেবল মাত্র সহযোগেরই কথা ভেবেছি।"

এই সময় গান্ধীজীর প্লুরিসি হয়। গোখলেও এই সময় ফ্রান্স থেকে বিলাত আসেন। গান্ধীজী তখনও আহার সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি আফ্রিকায় থাকতেই আহারে সংযম ও উপবাস সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি বহুকাল পূর্বে গরুর দুধ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি চীনাবাদাম, টোম্যাটো ও ফল খেয়ে থাকতেন। তিনি দুধ, ডাল, শাকসজী খেতেন না। গোখলে ভারতে চলে গেলেন। গান্ধীজী একটু সুস্থ হয়ে স্বদেশ যাত্রা করলেন। জাহাজে তিনি ফলাহার করেই কাটালেন। তিনি জাহাজে ইংরাজ-যাত্রীদের শাসকের মনোবৃত্তি এবং ভারতীয় যাত্রীদের দাস-মনোবৃত্তি লক্ষ্য করে খুব মনঃক্ষুন্ন হন। ৯ই জানুয়ারী বোম্বাইতে তাঁকে গোখলের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা দেওয়া হ'ল। বোম্বাইএর গভর্ণর গান্ধীজীকে বললেন, "কোন আন্দোলন করার পূর্বে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।" তদুত্তরে গান্ধীজী বলেন, "সত্যাগ্রহ করার পূর্বে আমি সর্বদা বিরোধী পক্ষের কথা জেনে নিই এবং তাঁকে আমার অনুকূলে আনার চেষ্টা করি।" তিনি নববর্ষে কাইজারি-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক পান।

ভারতবর্ষের যুদ্ধে সাহায্য ও ইংরাজের প্রতিশ্রুতিঃ— ইংরাজের ন্যায়যুদ্ধের ধাপ্পাবাজীর মোহে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতও প্রতারিত হয়েছিল। ইংরাজ যুদ্ধের বিপাকে পড়ে ভারতের সম্মুখে বহু রঙিন ছবি তুলে ধরল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমে মিত্রশক্তির বিপদ আরও বেশী ঘনীভূত হয়ে আসে; তখন মণ্টেগু চেমর্সফোর্ড রিপোর্টে ভারতকে দায়িত্বশীল শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ২রা এপ্রিল দিল্লীতে যুদ্ধ-সম্মেলনে ভরসা দেওয়া হ'ল—'ভারতের স্বাধীনতার দিন সমাগত'। এই আশা-মরীচিকায় বিভ্রান্ত হ'য়ে ভারত যুদ্ধে নিঃস্বার্থভাবে প্রচুর

সাহায্য করল। নয় লক্ষ পঁচাশী হাজার ভারত সন্তান সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হ'ল, ভারত অপরিমিত অর্থ ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম যোগাল। ভারতের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল পরে বিশ্বস্ততার উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। যুদ্ধ শেষে ভারতের এই সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হ'ল। অকৃতজ্ঞ ইংরাজ ভারতের অতুলনীয় ত্যাগের কথা ভুলে গেল। স্বাধীনতা দেওয়ার পরিবর্তে সুরু হ'ল এক নির্য্যাতনের যুগ। সরকার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কুখ্যাত রাউলাট আইন পাশ করল এবং ভারতরক্ষা বিধিগুলির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করল। সে-সব বিধিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হ'ল। এবার মোহমুক্ত ভারতে শাসকের প্রতি এক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত হ'ল। সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সুরু হ'ল এক ভারতব্যাপী বিপ্লব। গান্ধীজী এই বিপ্লবকে এই জাতি-চেতনাকে এক অভিনব অহিংস পথে পরিচালিত করলেন। চল্লিশ কোটি লোকের নিকট তিনি অহিংসা ও সত্যের অপরাজেয় শক্তির রূপ দেখিয়ে দিলেন—ইহাই হ'ল গান্ধীজীর প্রতিভা।

ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা—কংগ্রেসের প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিমান কয়েকজন ইংরাজ (যথা Hume, Wedderburn) শাসক ও শাসিতের স্বার্থের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেন। এঁদের প্রভাবে দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের ভিতর আনুগত্যের ও আপোষের মনোভাব বজায় থাকে। জাপান কর্তৃক রাশিয়ার পরাজয়ে ভারতবাসীর মনে জাতি-গর্বের মনোভাব জেগে উঠে। কতকগুলি দমনমূলক আইন প্রবর্তন এবং লর্ড কার্জনের বঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি অপ্রীতিকর কার্যাবলীতে ভারতে ক্রমশঃ আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদের ও কংগ্রেসের ভিতর চরমপন্থী দলের উদ্ভব হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন আইনসম্মত (constitutional) পথ ত্যাগ করে অন্যপথে চালিত হয়। কংগ্রেসের বাহিরে এক দল রাজনৈতিক

ডাকাতি, গুপ্তহত্যা, বোমা দিয়া ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্য সুরু করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসও দুই দলে বিভক্ত হয়। নরমপন্থীদের হাত হতে চরমপন্থীদের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব চলে আসে। তাঁরা ভারতকে ব্রিটিশের সকল সম্পর্ক হতে মুক্ত করতে চায়। এই নূতন কংগ্রেসের নেতা হন তিলক। কিন্তু তখনও কংগ্রেসের প্রভাব শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভদ্রলোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কংগ্রেস জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান ছিল না। এদিকে মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বিপ্লবীরা ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করল। এই রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে গান্ধীজীর ভারতে আগমন হ'ল। তিনি দীর্ঘ তেইশ বৎসর বিদেশে ছিলেন সেইজন্য ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি স্থির করবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেবলমাত্র কৃষক, শ্রমিক ও সামাজিক আন্দোলনে এবং গঠনমূলক কাযে মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। এই সকল ব্যাপারে তিনি সত্যাগ্রহের শক্তিকে যথেষ্ট পরীক্ষা করার সুযোগ পান। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক বিদ্রোহের কোন কথা চিন্তা করেন নাই এবং ইংরাজের প্রতি তাঁর বিশ্বাসও ছিল অগাধ। তিনি জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা স্বত্বেও সাম্রাজ্যের সহিত সহযোগিতার নীতি সমর্থন করে আসছিলেন। কি করে তাঁর এই মত পরিবর্তন হয় তাহা আমরা বলব। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বেকার আন্দোলন আলোচনা করব।

ভারতবর্ষে গান্ধী-যুগ

গোখলের প্রস্তাব—গান্ধীজী পুণায় গিয়ে গোখলের পরামর্শ অনুসারে Servant of India Societyতে যোগদান করতে সম্মত হলেন কিন্তু অন্য সদস্যরা তাঁর আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা সমর্থন করলেন না।

গোখলে গান্ধীজীর নিজের প্রদেশ গুজরাটে একটি আশ্রম স্থাপন করে সেবাকার্য করতে পরামর্শ দেন। গোখলে আশ্রমের প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহ করেও দেন। গোখলের পরামর্শে তিনি এক বৎসর যাবৎ তৃতীয় শ্রেণীতে ভারতের নানা নগর ও জনপদ পরিভ্রমণ করে দেশ সম্বন্ধে নানা বিষয় অভিজ্ঞতা ও তথ্য অর্জন করেন।

বিরাম গাঁওয়ের শুল্ক—বিরাম-গাঁওয়ে যাত্রীদের নিকট শুল্ক আদায়ের জন্য তাদের হয়রানি করা হত। গান্ধীজী এই প্রথার বিষয় অনুসন্ধান করে জানেন অভিযোগগুলি সত্য। বোম্বাই ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আবেদনে কোন ফলোদয় হয় না। তিনি এর প্রতিবাদে সত্যাগ্রহের প্রস্তাব করেন। তিন বৎসর পরে লর্ড চেমসফোর্ড এই শুল্ক তুলে দেন। গান্ধীজী এই জয়কে ভারতে সত্যাগ্রহের ভিত্তি বলে অভিহিত করেন। ভাবী আশ্রমের অভিজ্ঞতার জন্য তিনি শান্তিনিকেতন ও গুরুকুল আশ্রম পরিদর্শন করেন।

শান্তিনিকেতনে—পুণায় গান্ধীজীর বিদায়-সম্বর্ধনায় গোখলে অসুস্থ অবস্থায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। এই ব্যাপার তাঁর জীবনে স্থায়ী দাগ রেখে যায়। শান্তিনিকেতনে কাকা কালেলকার, মগনলাল গান্ধী, এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সন গান্ধীজীকে ও তাঁর সঙ্গীদের আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করেন। তাঁরা শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে মিশে কায়িক শ্রমের কাজের চর্চ্চা করতেন। তাঁরা নিজেদের কাজ যথা বাসন মাজা, রান্না করা ইত্যাদি সব নিজেরাই করতেন। গোখলের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি ও কস্তুরীবাই শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ন। অন্য সকলে সেখানে কিছুদিন থেকে যান। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে এই সময় বিলেত থেকে এক পত্রে তাঁকে **মহাত্মা** বলে বর্ণনা করেন। গান্ধীজীও রবীন্দ্রনাথকে **গুরুদেব** বলতেন।

এণ্ডরুজের ভারতে সত্যাগ্রহের প্রবর্ত্তনের এক প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "গোখেলের কাছে আমি সংকল্প করেছি যে অন্ততঃ এক বৎসরকাল শুধু দেশময় ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে দেশের দুরবস্থার বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করব, সক্রিয়ভাবে কোন আন্দোলন করব না। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সত্যাগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা তা বলা সম্ভব নয়।" গোখলে গান্ধীজীর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত 'হিন্দ্ স্বরাজ' পুস্তক পাঠ করে হেসে বললেন, "ভারতে এক বৎসর থাকলে তোমার এ সব বিচার আপনা-আপনি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।" গান্ধীজীর নূতন আধ্যাত্মিক শক্তি ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে সকল নেতাই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ—বর্ধমানে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনতে গান্ধীজী হয়রানের একশেষ হন। ট্রেণে ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি করে তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা না পেয়ে তিনি মধ্যম শ্রেণীতে আরোহণ করেন। রেলকর্ত্তৃপক্ষ আসানসোলে তাঁর নিকট পুণা পর্যন্ত দেড়গুণ ভাড়া আদায় করে। পরে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর প্রতিবাদে অতিরিক্ত ভাড়া ফেরত দেয়। এই সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি রেলকর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার, উদাসীনতা ও গাড়ীর অব্যবস্থা এবং যাত্রীদের অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা ও স্বার্থপরতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি জীবনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার পর প্রায় সব ক্ষেত্রেই তৃতীয় শ্রেণীতে রেল-ভ্রমণ করেন।

গুরুকুলে—গুরুকুলে গান্ধীজী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হৃষীকেশের সন্ন্যাসীরা গান্ধীজীকে পৈতা ধারণ ও শিখা রাখতে বলেন। তিনি শিখা রাখতে সম্মত হ'ন কিন্তু পৈতা ধারণ করতে সম্মত হন না কারণ সহস্র সহস্র ভারতবাসী পৈতা ধারণ করে না। তিনি কোন বর্ণের প্রভেদসূচক চিহ্ন ধারণ করতে রাজি হন না।

সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন—গোখলের মৃত্যুর পর গান্ধীজী একটু বিব্রত হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল গোখলের নেতৃত্বে দেশের আন্দোলনে যোগ দেবেন। তিনি পুনরায় ভারত-ভৃত্য সমিতির সদস্য হওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু কতক সদস্যের অমত হওয়ায় তিনি এই চেষ্টা হতে বিরত হন। তবে সদস্যদের স্নেহ হতে তিনি বঞ্চিত হন নাই। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মে আমেদাবাদের কোচরব নামক স্থানে শান্তি-নিকেতনের আদর্শে আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি নিজের মাতৃভাষা মারফত গুজরাটে বেশী সেবা করতে পারবেন। আমেদাবাদে অনেক ধনী ব্যক্তির বাস সেজন্য অর্থ সাহায্যের সম্ভাবনা বেশী। আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র, সেখানে পুরাতন চরকাশিল্পের পুনরুদ্ধারের সুযোগ অনেক বেশী—এই সকল কারণে আমেদাবাদ আশ্রমের উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়। পঁচিশজন সহকর্মী নিয়ে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আশ্রম সবরমতীতে স্থানান্তরিত হয়।

আশ্রমের উদ্দেশ্য—গান্ধীজী শুধু দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই চান নাই, দেশের জনসাধারণকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কবল থেকে মুক্ত করে দেশে সত্যকার স্বাধীন ভারতীয় মনোভাব গড়তে চান। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে দেখতে পান। অতীতের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতার সম্পদে সমৃদ্ধ করে এক নব সংস্কৃতি গড়ে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্কৃতি যাহা ভারতীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে সেই সব সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের দ্বারা এক নূতন আদর্শ সংস্কৃতি গড়তে চান। এই সংস্কৃতিতে হিন্দুদের কোরাণ বাইবেল এবং মুসলমানদের হিন্দুর শাস্ত্র পড়বার সুযোগ থাকবে। এই সংস্কৃতি বিশ্বাস করবে এক মানবধর্ম্মে যেখানে অস্পৃশ্যতা থাকবে না। ছাত্রদের

জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে পেশাদারী শিক্ষার দ্বারা এক স্বাধীন ও আত্মনির্ভর শীল মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। ভদ্রলোকদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষা ও কারিগরের মধ্যে সাহিত্যের শিক্ষা—দুয়ের ফলে জাতীয় সম্পদ বণ্টনের অসাম্য ও সামাজিক বিভেদের প্রতিবিধান ঘটবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের আত্মঘাতী ব্যবধান দূর হবে। আশ্রমে এই সকল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই আশ্রমে যে ভারতীয় শিক্ষার হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হবে তাহা সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করবে। এই আশ্রমে শুধু ছাত্রকে নয় শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হয়। এই আশ্রমকেই তিনি ভবিষ্যৎ আন্দোলনের অন্তঃস্থল করে তোলেন। এই আশ্রমে ভারতের মাল-মশলা দিয়ে এক নিখাদ শক্তিমান আত্মা গড়ে তোলেন।

আশ্রমের ব্রত—আশ্রমবাসী ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে নিম্নলিখিত ব্রত গ্রহণ করতে হয়:—

(১) **সত্যের ব্রত**—কেহ কোন সময়ই এমন কি দেশের মঙ্গলের জন্যও মিথার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। দেশ, মাতাপিতা অপেক্ষাও সত্য বড়।

(২) **অহিংসার ব্রত**—কেহ কোন জীবকে হত্যা করবে না, অপরাধীকে আঘাত করবে না, কাহারও উপর রুষ্ট হবে না। অত্যাচারের প্রতিরোধ করবে কিন্তু অত্যাচারীকে আঘাত করবে না। প্রেমের দ্বারা অত্যাচারীকে জয় করবে।

(৩) **কৌমার্য্যের ব্রত**—স্ত্রীলোককে কামনার সঙ্গে দেখবে না। কার্য্যে ও চিন্তাতে পাশবিক বৃত্তি দমন করবে। বিবাহিত পুরুষকে স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত জীবন পূর্ণ পবিত্রতার সম্পর্ক বজায় রেখে বন্ধুর মত কাটাতে হবে।

(৪) **রসনার সংযম**—পশুপ্রবৃত্তি প্ররোচক ও অনাবশ্যক খাদ্য বর্জন করবে।

(৫) **চৌর্য পরিহার**—পরদ্রব্য চুরি করা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিষ ব্যবহার করা দুই পরিত্যজ্য।

(৬) **অধিকার ত্যাগের ব্রত**—কেহ অধিক জিনিষের অধিকারী হবে না, অধিক জিনিষ রাখবে না। দৈহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য জিনিষও রাখবে না। সকলে জীবনকে সরল করবে।

(৭) **স্বদেশী ব্রত**—যাহাতে প্রতারণার সম্ভাবনা আছে এমন জিনিষ, বিদেশী জিনিষ, কলে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করবে না। কারণ কলে শ্রমিকরা প্রচুর কষ্ট পায়।

(৮) **নির্ভীকতা**—অহিংসা ও সত্যের ব্রতীকে সর্বপ্রকার ভয়—রাজার, সাধারণের, জাতির, পরিবারের, দস্যুর, হিংস্রজন্তুর ও মৃত্যুর ভয় ত্যাগ করতে হবে। নির্ভীক মানুষ সত্যের জোরে আত্মার জোরে অপরের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেন।

(৯) সকলকে দৈহিক পরিশ্রম করে নিজের নিজের কাজ করতে হবে।

চারি বা ততোধিক বৎসর বয়স্কের ছেলেরা আশ্রমে ভর্তি হত। এদের দশ বৎসর পর্যন্ত আশ্রমে বাস করতে হত। এই সময়ে ছেলেদের পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ হত না। তারা সাদাসিদে পোষাক পরত, নিরামিষ আহার গ্রহণ করত, সময় মত প্রার্থনা করত। বৎসরে তিন মাস প্রত্যেক ছাত্রকে পদব্রজে ভারতের নানাস্থানে ঘুরে দেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হত। প্রত্যেককেই চরকায় সূতা কাটতে হত, কৃষি এবং অন্যান্য কারিগরি কাজ শিখতে হত। প্রত্যেক ছাত্রকেই হিন্দী ও দ্রাবিড়ী কথ্য ভাষা, ইংরাজি, সংস্কৃত পড়তে হত এবং উর্দু, বাংলা, তামিল, তেলেগু ও দেব নাগরী অক্ষর চিনতে হত। ছাত্ররা নিজেদের কথ্য ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অংক, অর্থনীতি শিখত।

ধর্মের একটি আবহাওয়া আশ্রমকে ঘিরে রাখত। আশ্রমে কেহ অস্পৃশ্যতা মানতে পারত না। ছাত্ররা বিনা খরচায় শিক্ষা পেত।

আশ্রমে গোলযোগ—দুধাভাই নামক এক অস্পৃশ্য জাতীয় শিক্ষক আশ্রমে সপরিবারে বাস করতে এলেন। ইহাতে আশ্রমের কয়েকজন সাহায্যকারীদের মধ্যে খুব আন্দোলন সুরু হল। ইহারা অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। আশ্রমের কুয়া ব্যবহারে আপত্তি উঠল এমন কি দুধাভাইকে মারের হুকুমি দেওয়া হ'ল। গান্ধীজী নীরবে সহ্য করে জল নিতে লাগলেন কিন্তু সাহায্যকারীরা তাতে রুষ্ট হয়ে আশ্রমের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করলেন। বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে এমন ভীতি প্রদর্শিত হ'ল, তখন গান্ধীজীর হাতে একটি পয়সাও ছিল না। এই দুঃসময়ে অকস্মাৎ এক ধনী ব্যক্তি গান্ধীজীর হাতে তের হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। তিনি বলেন, "আমার জীবনে এমন নিঃসম্বল অনেক বার হয়েছি, 'শ্যামলিয়া' কোথা হতে সব জুটিয়ে দিয়েছে।" এর পর বর্ণ হিন্দুদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য আসতে লাগল।

'ভারত ছাড়'—১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসবে তিনি বলেন, "ভারতের মুক্তির জন্য যদি ইংরাজকে বিতাড়ন করা প্রয়োজন হয় তবে তাহা প্রকাশ করতে আমি কুণ্ঠাবোধ করব না। ইহাতে আমি মৃত্যু বরণ করতেও দ্বিধাবোধ করব না।" ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে জহরলালের সহিত গান্ধীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

গিরমিট-চুক্তি রদ—ভারত হ'তে পাঁচ বৎসর মেয়াদের চুক্তিতে বহু শ্রমিককে ভারতের বাহিরে পাঠান হ'ত। ইহাদিগের নাম ছিল 'গিরমিটিয়া'। মালব্যজী এই প্রথা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিল উত্থাপন করতে চান। বড়লাট অনুমতি দেন না। গান্ধীজী বহুস্থানে সভা করে

তুমুল আন্দোলন করেন এবং ৩১শে জুলাইএর মধ্যে প্রথা উঠিয়ে না দিলে সত্যাগ্রহ করবেন ঘোষণা করেন। তৎপূর্বেই সরকার এই প্রথা তুলে দেয়।

চম্পারণ কৃষক-সত্যাগ্রহ—চম্পারণে নীলকুঠি সাহেবদের জন্য চাষীদের বিঘা প্রতি তিন কাঠা জমিতে নীল চাষ করতে হত। ইহাকে 'তিন কাঠিয়া' প্রথা বলে। প্ল্যান্টার্স বা নীল কুঠিয়াল চাষীদের উপর নানাপ্রকারে অকথ্য অত্যাচার করত। বিহারের উকিল ব্রজকিশোর বাবু ও রাজকুমার শুক্ল নামক একজন নির্য্যাতিত কৃষকের আমন্ত্রণে গান্ধীজী মজঃফরপুর উপস্থিত হন। এই কৃষকটি ছিল নিরক্ষর গেঁয়ো অথচ দৃঢ়সংকল্প। সেখানে গান্ধীজী আদালত থেকে কৃষকদের মামলা তুলে নিতে পরামর্শ দেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে চম্পারণ ত্যাগ করতে আদেশ করেন। তিনি আদেশ অমান্য করে হস্তীপৃষ্ঠে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করেন। ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন। কর্তৃপক্ষ বেগতিক বুঝে পরে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা তুলে লন এবং তাঁকে কৃষকদের অবস্থা জ্ঞাত হবার জন্য তদন্তের অনুমতি দেন। সে তদন্ত একটা বিরাট ব্যাপার। সাত আট জন লোক সারাদিন খেটে হাজার হাজার কৃষকের বিবৃতি সংগ্রহ করতে লাগল। এমন সময় কর্তৃপক্ষই গান্ধীজীকে নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সর্ত থাকে যে তদন্ত সন্তোষজনক না হলে কৃষকদের নিয়ে সত্যাগ্রহ করার স্বাধীনতা তাঁর থাকবে। তদন্তে কৃষকদের অভিযোগ সত্য বলে স্বীকৃত হয়। ফলে ১৯ ৮ খৃষ্টাব্দে চম্পারণ কৃষি-আইন পাশ হয়। শত বৎসরের 'তিন কাঠিয়া' কুপ্রথা উঠে যায়। প্ল্যান্টার্সরা কৃষকদিগকে অনেক অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হয়। ভারতে চম্পারণ সত্যাগ্রহই প্রথম কৃষক-আন্দোলন। গান্ধীজীই মূক, শোষিত, নির্যাতিত কৃষক সমাজকে প্রথমেই অহিংস সংগ্রামের পথ দেখালেন। তিনি

আদালতে একটি বিবৃতিতে বলেন, "আমি চম্পারণে অত্যাচারিত কৃষকদের অবস্থা জানবার জন্য এসেছি। কাজেই আমাকে ব্রিটিশ আইন অমান্য করতে হয়েছে। আমি ব্রিটিশ আইন অপেক্ষাও উচ্চতর এক আইনের নির্দেশে কাজ করছি। সেই নির্দেশ হচ্ছে বিবেকের নির্দেশ। ইংরাজের বিরুদ্ধে ইহাই আমার প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলন। আমি এই নীতিই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম যে আমাকে আমার দেশের কোন স্থান পরিত্যাগ করতে বলার অধিকার ইংরাজের নাই।" তাঁর প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলন জয়ী হ'ল। সেজন্য তিনি আইন-অমান্যই ভারতকে বিদেশীর নাগপাশ হতে মুক্ত করার পদ্ধতি হবে বলে প্রথম স্থির করেন। এই সত্যাগ্রহ বিহারে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন।

আমাদাবাদে শ্রমিক-সত্যাগ্রহ—গান্ধীজী আমেদাবাদের শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী মালিকরা মিলে তালা বন্ধ করেন। গান্ধীজীর মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি নিম্নলিখিত সর্তে ধর্মঘট স্থরু করেন: (১) শান্তি ভঙ্গ করা হবে না। (২) জোরজুলুম করে ধর্মঘটে যোগ দান করতে কাহাকেও বাধ্য করা হবে না। (৩) শ্রমিকরা ভিক্ষার অন্ন খাবে না। (৪) ধর্মঘটে সকলে দৃঢ় থাকবে। পয়সার অভাব হলে তারা অন্য কাজে উপায় করবে। তৃতীয় সপ্তাহে শ্রমিকদের মনের জোর কমে আসে। অনেকে কাজে যোগ দেওয়াতে তিনি তিন দিন অনশন করেন। মালিক ও শ্রমিকের ২২ দিন পরে আপোষ মীমাংসা হয়। শ্রমিকদের মাহিনা পঁয়ত্রিশ টাকা বাড়ে। মালিকরা শ্রমিকদের অন্যান্য দায়িত্ব মেনে নেয়। এখানেও সত্যাগ্রহের জয়লাভ হয়। গান্ধীজী আমেদাবাদে ভারতের প্রথম 'শ্রমিক সঙ্ঘ' গঠন করেন। তদবধি ইহা মালিক ও মজুরদের স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষা করছে।

খেদা-সত্যাগ্রহ—গুজরাটের খেদা জেলায় শস্যহানির জন্য কৃষকরা খাজনা মকুব চাইলে কর্তৃপক্ষ অস্বীকৃত হ'ন। গান্ধীজী খাজনা বন্ধ করবার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। কর্তৃপক্ষ প্রথমে কৃষকদের জমি, ফসল, হাল, বলদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের উৎপীড়ন করে। শেষে সত্যাগ্রহের জয় হয়। কর্তৃপক্ষ খাজনা মকুব করেন। দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার :—প্রথমতঃ প্রত্যেক আন্দোলনের পূর্বে গান্ধীজী নিজে সব বিষয়ে তদন্ত করে আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত প্রথমে মীমাংসার চেষ্টা করতেন। এই কয়েকটি সংগ্রামে তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

যুদ্ধে সাহায্য—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে চেমস্‌ফোর্ডের আহ্বানে গান্ধীজী অনেক বিচার-বিবেচনার পর যুদ্ধ-পরিষদে যোগ দেন। তিনি সরকারকে বিপদে সাহায্য করা উচিৎ বিবেচনা করেন। তিনি খৃষ্টান ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস করে হিন্দীতে এক কথায় বলেন, "আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।" গান্ধীজী খেদায় গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করেন। এখানে তিনি এই কালে ভীষণ বাধা প্রাপ্ত হন। তিনি বললেন, "আমরা যদি অস্ত্র ব্যবহার করতে চাই এই তার স্বর্ণ সুযোগ।" এই কাজে অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তিনি ছাগ-দুগ্ধ পান করতে আরম্ভ করেন। তিনি বলতেন, "পশুর দুগ্ধ মাত্রই মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ।" রোগ শয্যায় শুয়েই তিনি চরকায় সূতাকাটা অভ্যাস করেন।

রাউলাট বিল ও প্রথম সর্ব-ভারতীয় হরতাল—এই সময় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি বটে। গান্ধীজী ভার্সাই শান্তি-সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি তাতে যোগদান করেন নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের

প্রথমেই রাউলাট কমিটির সুপারিশগুলি প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের নিঃস্বার্থ সাহায্যের প্রতিদানে কর্ত্তৃপক্ষের এই ভয়ংকর আইন (বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য জেলে আটক রাখা) প্রবর্ত্তনে দেশের নেতারা স্তম্ভিত হয়ে যান। গান্ধীজী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আইন-অমান্যর জন্য নানা স্থানে ছোট ছোট 'সত্যাগ্রহ-সভা' আহ্বান করেন। নির্বাচিত অল্প লোক সত্যাগ্রহ শপথ গ্রহণ করেন যদিও তখন অনেকেই সত্য ও অহিংসার নীতি মানতে রাজি হন না। বোম্বাই, এলাহাবাদ, বাংলা, আসাম, বিহার, আমেদাবাদ প্রভৃতি বহুস্থানে গান্ধীজী এইরূপ সভায় বক্তৃতা দেন। ফেব্রুয়ারী মাসে বিলটি আইন পরিষদে উত্থাপিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সরকারকে সতর্ক করেন। পরিষদে বিতর্ক একটা প্রহসন মাত্র ছিল। প্রবল প্রতিবাদ স্বত্ত্বেও বিল পাশ হয়। গান্ধীজী বড়লাটকে বহুবার জানালেন, "বিলটি আইন হলেই আমি শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ করব।" সব আবেদন নিষ্ফল হল। ১৮ই মার্চ্চ বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই আইনে প্রথমে গ্রেপ্তার হন পাঞ্জাবের নেতা ডাঃ কিচলু ও সত্যপাল। ইহার কয়েকদিন পরে গান্ধীজী এই বিষয় সংবাদ পান। সেই দিনের ঘটনার কথা তিনি লেখেন, "সেদিন রাত্রিতে আমি এই কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল কিন্তু ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নি। অকস্মাৎ আমার প্রতি একটা স্বপ্নের নির্দেশ নেমে এল যে ভারতব্যাপী হরতাল করবার জন্য জনগণকে আহ্বান করতে হবে। সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে পবিত্র সংগ্রাম; কাজেই আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে এই সংগ্রাম আরম্ভ হওয়া ভাল। ভারতের জনগণ এই দিন কাজকর্ম্ম বন্ধ রেখে উপবাস ও প্রার্থনা করুক।" প্রথমে ৩০শে মার্চ্চ পরে ৬ই এপ্রিল এই আইনের প্রতিবাদে ভারতের সর্বত্র আত্মশুদ্ধির জন্য উপাসনা, সংযম ও

অনশন করার উদ্দেশ্যে হরতাল ঘোষণা করা হয়। ইহাই হ'ল গান্ধীজীর প্রথম সর্ব-ভারতীয় আন্দোলন যাহা জনসাধারণের বিবেককে স্পর্শ করল এবং ভারতের সর্ব শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করল। ৩০শে মার্চ্চ দিল্লীতে এবং অন্যত্র ৬ই এপ্রিল হিন্দু-মুসলমান অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত হরতাল পালন করেন। মুসলমানদের আমন্ত্রণে শ্রদ্ধানন্দ, নাইডু ও গান্ধীজী বিভিন্ন মসজিদে বক্তৃতা দেন। হাজার হাজার লোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হরতালে যোগ দেয়। তিনি ও নাইডু বোম্বাইতে নিষিদ্ধ পুস্তক (হিন্দ-স্বরাজ ও সর্বোদয়) বিক্রয় করে আইন ভঙ্গ করেন। লোকে এত উৎসাহিত হয়েছিল যে চার আনার বই পঞ্চাশ টাকায় কিনেছিল। কিন্তু স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য সভা ডাকা হলে অল্প লোকই সমাগত হল। গান্ধীজী বললেন, "আন্দোলনে যত লোক সাড়া দেয়, গঠনমূলক কার্যে তত লোক সাড়া দেয় না।" দিল্লী, লাহোর ও অমৃতসরে পুলিশ শান্ত শোভাযাত্রীর উপর গুলি চালায়। বহু লোক হতাহত হয়। লাহোরে পাঁচজন ইংরাজ নিহত হন। কতকগুলি গৃহ দগ্ধ হয়।

হাঙ্গামা ও প্রায়শ্চিত্ত—জনতাকে শান্ত করবার জন্য গান্ধীজী দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। তাঁর পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকার আদেশ দেয়। তিনি আদেশ অমান্য করবেন বলায় পথিমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জোড়পূর্বক মালগাড়ীতে চড়িয়ে বোম্বাই প্রেরণ করা হয়। এই সংবাদে বোম্বাইএর জনতা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তিনি জনতাকে শান্ত করে বললেন, "সত্যাগ্রহীকে চিন্তায় ও কাজে অহিংস হতে হবে। তা না হ'লে সত্যাগ্রহ বন্ধ করব।" আমেদাবাদে ও বিরামগাঁয়ে অনেক লোক জখম হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ কয়েক স্থানে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি প্রকৃত অপরাধীদিগকে দোষ স্বীকার করতে এবং সকলকে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে একদিনের জন্য অনশন করতে নির্দেশ দেন। তিনি নিজে তিন

দিন অনশন করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া (বোম্বে ক্রণিকলের সাপ্তাহিক পত্র) ও নবজীবন পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন।

হিমালয় তুল্য ভুল (Himalayan Blunder)—**আইন অমান্যর তাৎপর্য**—ইহার পর গান্ধীজী নাদিয়াদে যান। এই সব দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে গান্ধীজী বুঝতে পারেন যে তিনি এক সাংঘাতিক ভুল করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "আমার স্পষ্ট বোধ হল আমি অসময়ে জনগণকে আইন অমান্য করতে বলে ভুল করেছি। আইন অমান্য করার যোগ্যতা অর্জন করার পূর্বেই আমি তাহাদিগকে আইন অমান্য করতে বলে-ছিলাম। আইন অমান্য করার পূর্বে সকলকে ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বুঝতে হবে। লোকে সাধারণতঃ শাস্তির ভয়ে ভাল আইন মানে। শাস্তির ভয় না থাকলে ভাল লোকও ভাল আইন মানতে চেষ্টা করে না। আইন না থাকলেও লোকে যখন স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্য পালন করতে শেখে তখন তাদের খারাপ আইন ভঙ্গ করার অধিকার জন্মে। সকলের সে অধিকার আসে না, সেজন্য বাছা বাছা শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা উচিত। অনেকে এই ভুল স্বীকার করার জন্য আমাকে হাসি-ঠাট্টা করে কিন্তু আমি মনে করি সত্যাগ্রহীর পক্ষে অপরের হাতীর মত দোষকে সর্ষপ তুল্য দেখতে হবে এবং নিজের সর্ষপ তুল্য দোষকে হাতীর মত দেখতে হবে।" তিনি ব্যাপক সত্যাগ্রহে হিংসাত্মক কার্য সম্পন্ন হয় বলে নির্বাচিত এক এক দল লোককে সত্যাগ্রহ শিক্ষা দেন।

জালিয়ানওয়াবাগ হত্যা—গান্ধীজী ৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ ঘোষণা করেন। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়াবাগ নামক প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসবে প্রায় বিশ হাজার লোক সমাগম হয়। ইহা নিছক ধর্মোৎসব। রাজনীতির সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ১২ই রাত্রিতে জেনারেল ডায়ার পাঞ্জাবে সভাসমিতি ও

জন-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করেন। ১৩ই সকালে জনতা এই আদেশের বিষয় কিছুই জানতে পারে নাই। জনতা শান্ত ছিল। ডায়ারের হুকুমে জনতাকে সতর্ক না করে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র জনতার উপর দেড় শত সৈন্য মেশিন-গান দিয়ে দশ মিনিট অবিশ্রান্ত গুলি চালাল। বাহির হবার রাস্তা ছিল না। ইহাতে চার শত লোক নিহত ও বহুলোক আহত হল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হল। নেতাদিগকে রাজপথে চাবকান হয়, হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করান হয় এবং হাতে শিকল বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, মেয়েদের নগ্ন করে রাস্তায় মার্চ করান হয়। অনেকে অজ্ঞাতস্থানে কারারুদ্ধ হন। এইদিন ভারতের নূতন মন্ত্রে দীক্ষার দিন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে জনসাধারণ গান্ধীজীকে নেতৃত্বে বরণ করেন।

গান্ধীজী বলেন, "এক সহস্র কেন, বহু সহস্র নিরপরাধ নরনারীর হত্যাকে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। ফাঁসী যাওয়াকে জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার বলে গ্রহণ করতে হবে।" সেন্সর বিভাগ অনেকদিন এই হত্যার ব্যাপার গোপন রাখেন। জুলাই মাসের প্রথমে লোকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পায়। গান্ধীজীর পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারের তদন্তের জন্য হাণ্টার কমিটি নিযুক্ত করেন। মালব্যজী, এন্‌ড্রুজ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে ও বড়লাটের অনুমতিতে গান্ধীজী পাঞ্জাব যান। লাহোরে তিনি বিরাট অভ্যর্থনা পান। লোকে যেন আনন্দে পাগল হয়ে গেল। কংগ্রেস দেশবাসিকে হাণ্টার কমিটি বয়কট করার নির্দেশ দেয়। গান্ধীজী, দেশবন্ধু, মতিলাল, তায়াবজী ও জয়াকরকে লইয়া একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত কার্যের জন্য গান্ধীজীকে পাঞ্জাবের পল্লীতে

পল্লীতে যেতে হত। পাঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা রাশি রাশি হাতে-কাটা সূতা এনে তাঁর কাছে হাজির করত। কংগ্রেসের ও হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল। কংগ্রেস কমিটি অতি সতর্কতার সঙ্গে তদন্ত করেন। রিপোর্টের একটি কথাও আজ পর্য্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই। এই রিপোর্টে ডায়ার দোষী সাব্যস্থ হয়।

গান্ধীজী প্রকৃত সত্যাগ্রহীর ন্যায় অপরাধী কর্মচারির শাস্তি দাবী করিলেন না—কেবল ডায়ারকে ভারত থেকে সরাবার দাবি করলেন। কিন্তু হাণ্টার কমিটির রিপোর্টে কর্মচারীরা নির্দোষ সাব্যস্থ হ'ল। অধিকন্তু তারা পুরস্কৃতও হল। লাটসাহেব বললেন, "ডায়ার ঠিক করেছে" সরকারের এই সিদ্ধান্তে দেশব্যাপী তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের সঞ্চার হয়।

খিলাফৎ আন্দোলন—ইংরাজ যুদ্ধ শেষে তুরস্কের সুলতান বা খলিফার সার্বভৌম ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করবে না—এই প্রতিশ্রুতিতে ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরাজকে যুদ্ধে সাহায্য করেন। যুদ্ধ শেষে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় না। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে চুরমার করা হল। ইহাতে ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর ভারতে খিলাফৎ দিবস শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। ২৪শে নভেম্বর দিল্লীতে গান্ধীজী নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং 'অসহযোগ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি এই অসহযোগ আন্দোলনকে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পন্থা-স্বরূপ মনে করেন। তিনি বলেন, "আমরা যদি 'নেশন' হিসাবে বাঁচতে চাই একের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ মনে করতে হবে। কেবল দেখতে হবে যে, দাবীটা ন্যায়সঙ্গত কিনা।" চতুর ইংরাজ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মধ্যে আসন্ন বিপদ বুঝে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। গান্ধীজী এই শাসন সংস্কার গ্রহণে সম্মত হলেন এবং

চরমপন্থী তিলক ও দেশবন্ধুকে সম্মত করালেন। তিনি জালিয়ানওয়ানা স্মৃতি কমিটির ট্রাষ্টি নিযুক্ত হন। খিলাফৎ পুনঃ স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডের ও ভারতের কর্তৃপক্ষকে আবেদন করা হল। এই সময় থেকে গান্ধীজীর কাঁধে কংগ্রেসের গুরুতর দায়িত্বের বোঝা পড়ল। গান্ধীজী তিলক ও দেশবন্ধুর সহায়তায় কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র রচনা করেন। কংগ্রেসের রাজনীতিতে তাঁর এই প্রথম যোগদান।

অসহযোগ (Non-co-operation) আন্দোলন—অমৃতসর অধিবেশনে কংগ্রেস গান্ধীজীর মণ্টেগু শাসন-সংস্কার গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু তিনটি ঘটনা দেশকে অসহযোগ আন্দোলনের দিকে দ্রুত আকর্ষণ করল—হাণ্টার কমিটির রিপোর্টে দেশব্যাপী তীব্র ঘৃণার উদ্রেক, বড়লাট কর্তৃক কয়েকজন রাজবন্দীদের প্রাণদণ্ড এবং তুরস্কের সহিত অপমান-জনক সন্ধি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন তারিখে এলাহাবাদে সর্বদলীয় সভায় গৃহীত অসহযোগের এক চরম পত্রে গান্ধীজী সমস্ত কারণ বড়লাটকে দেখালেন এবং সর্তাবলী পূরণের জন্য এক মাসের সময় দিলেন। বড়লাট ইহাকে অর্বাচীনের পরিকল্পনা বলে আখ্যা দেন। সময় উত্তীর্ণ হলে ১লা আগষ্ট হতে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হবে গান্ধীজী ঘোষণা করেন এবং ৩১শে জুলাই উপাসনা ও অনশন দ্বারা আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য পবিত্র হরতাল পালন করতে উপদেশ দেন। সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মালব্য, দেশবন্ধু, বেশান্ত, বিপিন পালের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপুল ভোটাধিক্যে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কংগ্রেসে নূতন গান্ধী-যুগের প্রবর্তন হয়। তিনি সেই বৎসরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি দেন। কংগ্রেসের সমগ্র পরিবেশ বদলে যায়। গান্ধীজী দেশের একনায়কত্ব পান। তিনি চরকাসহ ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মধারা—এই আন্দোলনে নিম্নলিখিত কর্মধারা গৃহীত হয়ঃ—(১) সরকারি খেতাব ও অবৈতনিক চাকরি ত্যাগ; (২) আদালত, সরকারি স্কুল বয়কট; (৩) নূতন পরিষদ বর্জন; (৩) কোন সরকারী চাকরি (সামরিক বা অসামরিক) গ্রহণে, সরকারি ঋণ গ্রহণে অস্বীকৃতি; (৪) সরকারি ভোজশালা, নিমন্ত্রণ বা জলশা বয়কট, আইনসভা বর্জন, (৫) সর্বত্র পঞ্চায়েৎ গঠন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন। গান্ধীজী কাইজারি-ই-হিন্দ্ স্বর্ণ পদক ও অন্য দুইটি পদক ফেরত দিয়ে বড়লাটকে লেখেন, "যে সরকার দুর্নীতি ও অন্যায়ের কালিমায় কলঙ্কিত তাকে আমি বিন্দুমাত্র স্নেহ বা সম্মানের প্রশ্রয় দিতে পারি না। আজ এই সরকারকে সকল ভুল ত্রুটি সংশোধন করাবার প্রয়োজন হয়েছে।" গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, আইন-অমান্য, ভারত-ছাড়, আন্দোলন সব পৃথক আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় আইন-অমান্যের বা কর বন্ধের কোন ধারা ছিল না। আইন-অমান্য ও সত্যাগ্রহ অল্প লোক দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলে করা হ'ত। অসহযোগ ছিল প্রকৃত গণ-আন্দোলন। অসহযোগের প্রকৃত তাৎপর্য— "অসহযোগের লক্ষ্য ইংরাজ বা প্রতীচ্য নয়। বস্তু-সভ্যতা এবং বস্তু-সভ্যতার অনুগামী লালসা ও দুর্বলের শোষণের সহিতই আমাদের অসহযোগ। ইহার উদ্দেশ্য হ'ল—সমগ্র মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগের পূর্বে ভারতের সকল শক্তিকে সংগ্রহ করা, গ্রথিত করা।"

জনতা-তন্ত্রের (Mobrule) ভীতি—কংগ্রেস প্রস্তাবানুযায়ী সারা-দেশব্যাপী আলোড়ন দেখা দিল। দলে দলে লোক আইন, আদালত, স্কুল, কলেজ, সরকার চাকরি পরিত্যাগ করল। দেশময় মুমুক্ষু জনগণের এক অপূর্ব জাগরণ দেখা দিল। জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরে এল। হিন্দু মুসলমান সকলশ্রেণীর নরনারী আন্দোলনে যোগ দিল। গান্ধীজী শৃঙ্খলাহীন হিংসাত্মক

কার্য বা জনতাতন্ত্রকে বরাবরই ভয় করতেন। তিনি বলতেন, "ভারতকে যদি হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করতে হয় তবে শৃঙ্খলা ও সম্মানজনক হিংসার দ্বারাই করতে হবে। জনতার শাসন আমরা কোনো মতেই গ্রহণ করব না। এমন কি আনন্দিত প্রাণোৎফুল্ল শোভাযাত্রাও যে কোন মুহূর্তে বীভৎস উন্মত্ততায় পরিণত হতে পারে। তিনি জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম প্রবর্তন করেন যথা ছন্দ শৃঙ্খলা শিখাবার জন্য গণসঙ্গীত গীতি, অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা সভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ, রাস্তায় ভীড় নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর কর্মপন্থা গৃহীত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসে নিরুপদ্রব আইন-অমান্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন হতে কংগ্রেসে গান্ধীজীর এত প্রতিপত্তি বেড়ে গেল যে তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শ ব্যতীত কংগ্রেসের কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির কোন সদস্য মনোনীত হয় নাই এবং কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ পরিবর্তিত হয় নাই।

কর্ম পন্থা—ভারতবর্ষ যাহাতে আদর্শ ও বস্তু-সম্পদ উভয় দিক হতে নিজের প্রাচুর্য্যে জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গান্ধীজী নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মধারা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি ধর্মগত, জাতিগত, শ্রেণীগত ও অর্থনৈতিক পার্থক্য দূর করে সকল ভারতবাসীকে একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে আত্মনিয়োগ করেন।

(১) **খদ্দর**—ভারতের শতকরা আশী জন কৃষি-জীবি। বৎসরে পাঁচ মাস তারা বেকার থাকে। জনসাধারণের এক দশমাংশ লোক অনশনে থাকে। বিদেশীরা কাপড় দিয়ে বৎসরে ৬০ কোটি শোষণ করে। ভারতে তুলাও জন্মে প্রচুর। সেইজন্য গান্ধীজী বিলাতি বস্ত্র বয়কট, সূতাকাটা ও বস্ত্র-বয়ন

ও খদ্দর পরিধানের শপথ গ্রহণের নিয়ম প্রবর্তন করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী বেশ-ভূষা ত্যাগ করে শুদ্ধমাত্র কটিবাস সম্বল করলেন। "আমার দেশের এই অবস্থায় আমি এর চেয়ে বেশী ভোগের অধিকারী নাই।" তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন প্রত্যহ আধ ঘণ্টা সূতা না কেটে আহার করবেন না। এই সময়ে মিল-মালিকরা খদ্দর প্রচলনের বিরুদ্ধে মত দেন। একজন মিল-মালিক বলেন, "স্বদেশী আন্দোলনে আমরা বড় লোক হয়েছি। ভাল মানুষ বাঙ্গালীরা স্বদেশীর মোহে অগ্নিমূল্যে দেশী কাপড় কিনেছে। মিল-মালিকরা সেই সুযোগে বেশ দু'পয়সা করে নিয়েছে এবং বিলাতি মালকে স্বদেশী ছাপ দিয়ে চালিয়েছে। খদ্দর প্রচার করলে আপনিও নিরাশ হবেন। তার চেয়ে যাতে আরও কাপড়ের কল বাড়ে এবং দেশী কাপড়ের দ্বারা ভারতের চাহিদা মেটে সেই চেষ্টা করা উচিত।" গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে বলেন, "আমার ব্রত তা নয়। আমি কাপড়ের কলের এজেণ্ট হ'তে চাই না। আমি অর্ধবেকার গরীবদের হাতে কাজ দিতে চাই। কলের দ্বারা খুব কম লোকই কাজ পায়। চরকা লক্ষ লক্ষ লোককে কাজ ও ভাত যোগায়।"

(২) **অস্পৃশ্যতা বর্জন**—গান্ধীজী হরিজনদের জন্য যে হিমালয় প্রমাণ কাজ করে গিয়েছেন তাই তাঁর অমরত্বের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি কংগ্রেসের সাহায্যের অপেক্ষা না করে নিজেই জাতির এই কলঙ্ক মোচন করার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হন। তিনি অস্পৃশ্য জাতিদের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে, দেখতে পান। এই সম্বন্ধে তিনি লেখেন :—

"অস্পৃশ্যতাকে আমি হিন্দুধর্মের সকলের চেয়ে বড় কলঙ্ক বলে মনে করি। দক্ষিণ আফ্রিকার তিক্ত অভিজ্ঞতা বা খৃষ্টান ধর্ম-গ্রন্থ হতে আমি এই সকল মতামত গ্রহণ করেছি, ইহা মনে করা ভুল। এমন কি যখন

বাইবেল বা খৃষ্টানদেব সহিত আমার কোন পরিচয়ই হয় নাই, তখন হতেই আমি এই সকল ধারণা পোষণ করে আসছি।

"বার বৎসর বয়সের সময় অস্পৃশ্যতা যে অন্যায় এ ধারণা আমার মনে প্রথম যখন উদয় হয়, জাতিতে অস্পৃশ্য উকা নামে একজন ভাঙ্গী তখন আমাদের বাড়ীতে পায়খানা পরিষ্কার করত। তাকে ছুঁলে কী দোষ হয়, কেন তাকে ছুঁতে বারণ—এই প্রশ্ন আমি আমার মাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম। যদি দৈবাৎ উকাকে ছুঁয়ে ফেলতাম তবে আমাকে স্নান করতে বলা হত। অবশ্য আমি স্বভাবতঃই এই আদেশ পালন করতাম। আমি খুব কর্তব্যপরায়ণ ছিলাম এবং গুরুজনদের আদেশ কখনও অমান্য করতাম না, তবে পিতামাতার সম্মান রক্ষা করে তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক বার বাদানুবাদ করেছি। আমি মাকে বলতাম যে, উকার স্পর্শে যে পাপ হয় তাঁর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অস্পৃশ্যতা শাস্ত্রের বিধান নয়, হতেই পারে না।

"স্কুলে অনেক সময়ে অস্পৃশ্যদের সহিত ছোয়াছুয়ি হয়ে যেত। আমি পিতামাতার নিকট সে কথা কখনও গোপন করতাম না। মা বলতেন, অস্পৃশ্যের স্পর্শদোষ কাটাবার সকলের চেয়ে সহজ উপায় হল কোন মুসলমানকে ছুঁয়ে ফেলা। শুধু মার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ অনেক সময়ে তা করেছি কিন্তু কখনও মনে করি নি যে, এরূপ করা ধর্মের বিধান। পোরবন্দরে আমাদের ব্রাহ্মণ শিক্ষকের নিকট আমরা 'রামরক্ষা' ও 'বিষ্ণুপূজন' শিখি। 'জলে বিষ্ণু', 'স্থলে বিষ্ণুঃ' প্রভৃতি শ্লোকগুলি আমি কখনও ভুলি নাই। একজন দাসীর পরামর্শে রাত্রের অন্ধকারে ভূত-প্রেতের ভয় করলেই আমি "রামরক্ষার" শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতাম এবং মনে হত বেশ ফল হচ্ছে। আমি তখন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না যে, 'রামরক্ষায়' অস্পৃশ্যদের ছুঁলে পাপ হয়

এরূপ কোন বিধান থাকতে পারে। আমি তখনও "রামরক্ষার" অর্থ বুঝতাম না, বা বুঝলেও অতি সামান্যই বুঝতাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, যে 'রামরক্ষা' সমস্ত ভূতের ভয় দূর করতে পারে, সে কখনই অস্পৃশ্যদের স্পর্শের ভয়কে আমল দিতে পারে না।

"আমাদের পরিবারে নিয়মিত রামায়ণ পাঠ হত। লাধা মহারাজ নামে এক ব্রাহ্মণ পাঠ করতেন। তাঁর কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। নিয়মিত রামায়ণ পাঠে তিনি ব্যাধিমুক্ত হন! আমি ভাবতাম, একজন অস্পৃশ্য রামকে নৌকায় গঙ্গা পার করেছিল, একথা যে রামায়ণে লেখা আছে সেই রামায়ণের বিধান কি ইহা কখনও হতে পারে যে, কোন মানুষ অস্পৃশ্য; কারণ সে পতিত? আমরা ঈশ্বরকে 'পতিত পাবন' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করি। ইহা হতেই বুঝা যায় যে, হিন্দু হয়ে যে জন্ম গ্রহণ করেছে তাকে পতিত বা অস্পৃশ্য মনে করাই পাপ, এরূপ মনে করা শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই জন্য আমি ক্রমাগত বলে আসছি যে, অস্পৃশ্যতা একটা মহাপাপ। ১২ বৎসর বয়সেই আমি এই সব তত্ত্ব অবশ্য সুদৃঢ় প্রত্যয়রূপে অনুভব করি নাই তবে তখনই আমি অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলে মনে করতাম। বৈষ্ণব এবং গোঁড়া হিন্দুদের জানাবার জন্য আমি আমার নিজের জীবনের এই কাহিনী বললাম।

'আমি একজন সনাতনী হিন্দু—এ দাবী আমি বরাবর করে থাকি। আমি সংস্কৃতের বড় পণ্ডিত নই। আমি বেদ ও উপনিষদ সমূহ পড়েছি, তবে অনুবাদের সাহায্যে। সুতরাং আমার পাঠকে পণ্ডিতোপযোগী বলা যায় না। কিন্তু একজন হিন্দুর পক্ষে যেরূপ কর্ত্তব্য সেরূপভাবে আমি ঐসব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি এবং আমার ধারণা যে, সেগুলির প্রকৃতি মর্ম্মার্থ ধরতে পেরেছি। আমার বয়স ২১ বৎসর হবার পূর্ব্বে আমি অন্যান্য ধর্ম্মগুলি সম্বন্ধেও অধ্যয়ন করেছি।

"আমার জীবনে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমার মন হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে দোদুল্যমান হয়েছিল। মনের এই দোদুল্যমান ভাব কেটে গেলে আমি স্থির অনুভব করলাম যে, আমার পক্ষে মুক্তি কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মের মধ্য দিয়েই সম্ভব। তখন হতে হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস গভীরতর ও স্বচ্ছতর হতে থাকে। কিন্তু তখনও আমি বিশ্বাস করতাম যে, অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ নয়, আর অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ হয়, তবে সে হিন্দুধর্ম্ম আমার জন্য নয়।

"সত্য বটে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলে মনে করা হয় না। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে আমি কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে চাই না। আমার মত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভাগবত ও মনুসংহিতা হতে বচন উদ্ধৃত করা আমার পক্ষে কঠিন হতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ভাব আমি বুঝি, এ দাবী আমি করব। অস্পৃশ্যতার অনুমোদন করে হিন্দুধর্ম্ম পাপ করেছে। ইহার ফলে আমাদের অধঃপতন হয়েছে, তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যে আজ আমরা 'পারিয়া'। ইহা ন্যায়বান বিধাতার প্রদত্ত দণ্ড মাত্র। ইংরাজদিগকে তাদের রক্তাক্ত হস্ত ধুয়ে ফেলতে বলবার আগে আমাদের হিন্দুদের রক্তাক্ত হস্ত ধুয়ে ফেলা কি উচিত নয়? এমন কি মুসলমানরা পর্য্যন্ত এই অধর্ম্মের স্পর্শদোষে দুষ্ট এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়, পূর্ব্ব আফ্রিকায় হিন্দুর ন্যায় মুসলমানরাও 'পারিয়া' বলিয়া গণ্য। ইহা সমস্তই অস্পৃশ্যতা-পাপের বিষময় ফল।

"এখানে আমার বক্তব্য আবার বলি। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা জেনে শুনে অস্পৃশ্যতাকে তাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে করবে, যতদিন পর্যন্ত বেশির ভাগ হিন্দু তাদেরই একদল ভাইকে স্পর্শ করা পাপ বলে মনে করবে, ততদিন পর্যন্ত "স্বরাজ" পাওয়া অসম্ভব। যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরটিকে সঙ্গে না নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে পর্যন্ত অস্বীকার করে-

ছিলেন। আর যুধিষ্ঠিরের বংশধরগণ কি আশা করতে পারেন যে, অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়ে তাঁরা স্বরাজ পাবেন? যে সকল দুষ্কৃতির জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে শয়তানের আখ্যা দিয়ে থাকি তাহার মধ্যে এমন কোন্ অন্যায়টা নাই যাহা আমরা আমাদের অস্পৃশ্য ভাইদের প্রতি করি নাই?

"আমরা আমাদের ভাইদের নিচে চেপে রেখেছি; তাদের বুকে হেটেছি, ধুলায় তাদের নাক ঘসেছি, রক্ত চক্ষু হয়ে আমরা তাদের রেলগাড়ীর কামরা হতে ঠেলে ফেলে দিয়েছি—বৃটিশরাজ ইহার বেশী আর কী করে? ডায়ার ও ওডায়ারের বিরুদ্ধে আমাদের যে সকল অভিযোগ, সেগুলি কি অন্যেরা, আমাদের ভাইরা আমাদের বিরুদ্ধে আনতে পারে না?

"এই পাপ হতে মুক্ত হয়ে আমাদের পবিত্র হতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা দুর্ব্বল ও অসহায়কে রক্ষা করতে না পারি, যতদিন পর্যন্ত একজন মাত্র স্বরাজীর পক্ষেও আর একজন মানুষের মনে আঘাত দেয়া সম্ভব হবে ততদিন পর্যন্ত স্বরাজের কথা বলা বৃথা। একজনও হিন্দু বা মুসলমানের মনে এক মুহুর্ত্তের জন্যও এই ভাব আসবে না যে, সে নিরীহ হিন্দু বা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এরূপ অবস্থার নামই স্বরাজ। যদি এই সর্ত্ত আমরা পূর্ণ করতে না পারি তবে স্বরাজ পেলেও পর মুহুর্ত্তেই আমরা তা হারাব। আমাদের দুর্ব্বল ভাইদের প্রতি আমরা যে সকল অন্যায় করেছি। সেই পাপ ক্ষালন যদি আমরা না করি তবে আমাদের সঙ্গে পশুর প্রভেদ কিসে?"

অস্পৃশ্যদের কোন নেতা ছিল না, তারা নিজেদিগকে সংঘবদ্ধ করতে পারে নি। তিনি তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ হবার জন্য অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে উপদেশ দেন। কারণ অসহযোগ আন্দোলনের

অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, শ্রেণী সমন্বয় করা। তিনি বলেন, "সত্যিকার অসহযোগ এক প্রকার শুদ্ধির অনুষ্ঠান। অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাসীরা কখনও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না।" এমনি ভাবে গান্ধীজী ধর্ম, মানবতা ও দেশ-প্রেমের মহামিলন ঘটালেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমাদেবাদে অস্পৃশ্যদের সম্মেলন হয়। গান্ধীজী সভাপতি হন। তাঁর আবেদনে দেশের বর্ণ হিন্দুগণ অভূতভাবে সাড়া দেয়। তবুও মনে হয় হিন্দুব সামাজিক দেহ থেকে এই বিষ দূর করতে বহু বৎসর লাগবে।

গান্ধীজী সব সময়েই উৎপীড়ক অপেক্ষা উৎপীড়িতদিগের নিকট হইতে কাজেব প্রত্যাশা করেন বেশী। ইংরাজের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাবার আশা করেন নি, ভাবতবাসীর কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের যোগ্য হবার আশা করেন; বর্ণহিন্দুর কাছ থেকে যতটা আশা করেন, তার চেয়ে বেশী আশা করেন অস্পৃশ্যদের যোগ্য হবার সদিচ্ছার উপর। প্রকৃত সত্যাগ্রহী নিজের দোষ শুধরাবে, কাজের উপযুক্ত হবে।

(৩) **হিন্দু-মুসলমান মিলন**—ভারতের আর একটি কলঙ্ক হিন্দু-মুসলমানেব ভ্রাতৃবিরোধ। অবশ্য ইহার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই অনেকাংশে দায়ী। কুসংস্কার, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ভয়ের ফলে এবং সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকের উস্কানিতে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠছিল। ভারতের স্বাধীনতার জন্য এবং জাতি হিসাবে বাঁচবার জন্য এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মিলন অপরিহার্য। গান্ধীজী মুসলমানকে ভারত-মাতার দুই সন্তান বলে ভাবতেন। তিনি এই দুই সম্প্রদায়কে মিশাতে চান নি, চেয়েছিলেন যাহাতে দুই সম্প্রদায় নিজেদের বৈশিষ্ট বজায় রেখে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বন্ধুভাবে বসবাস করতে পারে। তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহাদি দ্বারা সংমিশ্রণের

কথা বর্তমানে অসম্ভব ব'লে মনে করতেন। তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য সারা জীবন চেষ্টা করলেন এবং এই মিলনের চেষ্টায় শেষে আত্মাহুতি দিলেন। (এই বিষয়ে তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণ দ্বিতীয় খণ্ডে আছে।)

(৪) **নারীর মুক্তি**—গান্ধীজী মনে করেন নারীর দৈহিক লালসার সর্বগ্রাসী চিন্তা পুরুষের মনকে সব সময়ে ছেয়ে রাখে। ইহার ফলে স্ত্রী-জাতির আত্মসম্মানের হানি হয়। নারীজাতির প্রতি এই হীন মনোভাব শুধু ভারতের দেহে নহে পৃথিবীর সর্বজাতির দেহে আর একটি গলিত ব্যাধি। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের কামনার বস্তু না ভেবে পুরুষের সম্মানের উপযুক্ত হবার ও সেই সম্মান দাবি করবার জন্য আহ্বান করলেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে নিজেদের দেহের কথা ভুলে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে এবং আদর্শের জন্য ত্যাগে, সহ্যগুণে, কারাবরণে, দুঃখভোগে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বলেন। তিনি বহুস্থানে পতিতাদের সহিত সততা ও সারল্যের সহিত আলাপ করেন। তিনি তাহাদিগকে সৎপথে থেকে জীবিকা অর্জন করতে বলেন, সূতা কাটার প্রস্তাব করেন এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। তিনি পুরুষদিগকে স্ত্রী-জাতিকে সম্মান করবার অনুরোধ করেন, "আমাদের বিপ্লবে পাপের জুয়ার কোন স্থান নাই; স্বরাজ কথার অর্থ হ'ল যে আমরা ভারতের প্রত্যেক অধিবাসিকে নিজের ভাই-ভগ্নির মত দেখব। স্ত্রীজাতি দুর্বলতর নহেন, তাঁরা মানব জাতির শ্রেষ্ঠতর মহত্তর অর্ধেক অংশ। এমন কি আজো তাঁরা ত্যাগ, নীরব সহিষ্ণুতা, বিনতি, বিশ্বাস ও বিদ্যার প্রতিমূর্তি। পুরুষের উদ্ধত যুক্তি অপেক্ষা নারীর অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞানই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

(৫) **পান-বিরোধ**—জাতির স্বাস্থ্য ও সংযম ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি দেশকে 'বোতলের বাতিক' হ'তে মুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর হ'ন। এই উদ্দেশ্যে বহু পান-বিরোধী দল গড়ে উঠল। ইহারা মদের দোকানে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করত। তবে তিনি বলপ্রয়োগ দ্বারা কাহাকে পবিত্র করার বিরুদ্ধে ছিলেন। মদ্য-পানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চরিত্রে অনেক দোষ প্রবেশ করে। মাদক-দ্রব্য মানুষের পাপের প্রতি আসক্তি জন্মায়। সে সাধারণতঃ বেশ্যাসক্ত হয়, জুয়া খেলে, জাল জুয়াচুরি করতে শেখে, ডাকাতি ও খুন করতে প্ররোচিত হয়। পৃথিবীতে যদি মাদক দ্রব্য না থাকত তবে পৃথিবীর অর্ধেক পাপকার্য সংঘটিত হ'ত না।

আন্দোলনের গতি—১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে কুড়ি লক্ষ চরকা প্রবর্তিত হয়। কংগ্রেস কমিটি বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ও যুবরাজের আগমনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আগষ্ট মাসে বিদেশী বস্ত্র অগ্নিদগ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বোম্বাইতে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে বিদেশী বস্ত্র অগ্নিদগ্ধ করা হয়। দীনবন্ধু এণ্ডরুজের প্রতিবাদের উত্তরে গান্ধীজী লেখেন, "কোন জাতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নাই এবং সমস্ত বিলাতি মালকে আমি ধ্বংস করতে চাই না। যে সকল মাল ভারতের অনিষ্ট করবে আমি সেইগুলিকে ধ্বংস করতে চাই। ইংরাজের কারখানাগুলি কোটি কোটি ভারতবাসীর সর্বনাশ করেছে। ইহারা ভারতবাসীর কর্ম কেড়ে নিয়ে তাহাদিগকে বেকার গোলাম ও অস্পৃশ্য করে তু'লেছে। তাদের স্ত্রী-কন্যাকে করেছে পণ্যা। আমি ইংরাজের প্রতি ভারতের ঘৃণা-বিদ্বেষকে মানুষ হতে পণ্যদ্রব্যে সরিয়ে দিচ্ছি। ইংরাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য বস্ত্র দগ্ধ করা হয় নি। এই বিষাক্ত দ্রব্য গরীবকে দিলে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত দেয়া হত"

এই বৎসর আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হয় কিন্তু অতি ঋষিতুল্য গান্ধীজীও জনতার হৃৎস্পন্দন ঠিক বুঝতে পারেন নি। তখন শাসকের বিরুদ্ধে জনতার উন্মত্ত আক্রোশ ও ঘৃণা ক্রমশ-ই বল সংগ্রহ করছে তাহা তিনি ধারণা করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে গান্ধীজীকে সতর্ক করে দেন। সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত মর্ম জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারল না।

মালিগাঁ, গিরিডি, আসামে গুরুতর সংঘর্ষ হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত ত্রিশ হাজার নরনারী গ্রেফ্‌তার হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আসামের চা-বাগানের ইংরেজ-মালিকের অত্যাচারের জন্য কুলিরা কাজ ছেড়ে দেয়, পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়। এর প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গে রেলে ধর্মঘট হয়। আগষ্ট মাসে মালাবারে মোপলার বিদ্রোহ করে। করাচীতে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের: দু-বৎসরের কারাদণ্ড হয়। এই সময় কংগ্রেস কমিটি প্রদেশকে আপন দায়িত্বে আইন অমান্য করার অধিকার ঘোষণা করে। খিলাফত কমিটি পূর্বেই আইন অমান্যের ঘোষণা করেছে। এমন সময় ১৭ই নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাইএ অবতরণ করেন। যারা তাঁকে অভ্যর্থনা করল উন্মত্ত জনতা তাঁদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিল, সম্পত্তি লুণ্ঠন করল। এই দুর্ঘটনা গান্ধীজীকে তীরের মত বিঁধল। তিনি সর্বত্র জনতাকে অহিংস পথ অবলম্বন করবার জন্য আদেশ করলেন। তিনি দ্বিতীয়বার আইন-অমান্য ঘোষণা প্রত্যাহার করলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রত্যেক সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা অনশত ব্রত অবলম্বন করলেন। এদিকে গভর্ণমেণ্টও ভীষণভাবে দমন নীতি আরম্ভ করল। বহুলোক গ্রেপ্তার হল, বহু আইন জারি হল। গুণ্টুরে প্রজারা কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করল।

চৌরী-চৌরা—৫ই ফেব্রুয়ারীতে গোরক্ষপুর জেলায় চৌরী-চৌরাতে

পুলিশ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গুলি চালায়। উন্মত্ত জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করে একুশ জন পুলিশকে জীবন্ত দগ্ধ করে।

আত্মাপরাধ-স্বীকৃতি—এই ঘটনার তিন দিন পরে ঘটনার বিষয় অবগত না হয়ে গান্ধীজী বড়লাটকে পত্র দেন যে বারদৌলীতে এক সপ্তাহের মধ্যে আইন অমান্য করা হবে কিন্তু চৌরী-চৌরার ঘটনার বিষয় জান্‌তে পেরে তিনি তৃতীয়বার আইন অমান্যর আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর অনুরোধে অসহ-যোগ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। গান্ধীজী আত্মশুদ্ধির জন্য পাঁচ দিন অনশন করেন। চৌরী-চৌরার থানা আক্রমণে অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবক কেহই অংশ গ্রহণ করে নি এবং পুলিশই প্রথম উস্কানি দেয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গান্ধীজী সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লন। তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় আত্মাপরাধ প্রকাশ্যে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ভগবান আমাকে সদয়ভাবে তৃতীয়বার সতর্ক করেন যে ভারতে এখনোও সত্য ও অহিংসার আবহাওয়া সৃষ্ট হয় নি। অনানুগত্য (Civil Disobedience) শান্ত, সত্য, বিনত, জ্ঞাত, স্বেচ্ছাকৃত, প্রীতিপূর্ণ, ঘৃণাশূন্য ও নিরপরাধ হওয়া চাই। আমার হিসাবে ভয়ংকর ভুল হয়েছে। ভগবান ও মানুষের কাছে আমি মাথা হেঁট করেছি। ভারতের সহিংস অংশের উপর অহিংস অংশের কর্তৃত্ব থাকা চাই। আন্দোলন বন্ধ করায় ভারতবর্ষ সত্য ও অহিংসার প্রতীক হল।” পুনরায় তিনি লেখেন, “চৌরী চৌরার মধ্য দিয়ে ভগবান স্পষ্টভাবে কথা কয়ে উঠলেন।……… আন্দোলন বন্ধ করা রাজনীতির দিক দিয়ে ত্রুটিহীন বা বিচক্ষণ না হলেও ধর্মের দিক দিয়ে ত্রুটি হীন। আমার দীনতা ও ত্রুটি স্বীকারের মধ্য দিয়ে দেশের প্রচুর উপকার হবে। আমি কেবল সত্য ও অহিংসার গুণের দাবি করি, কোন অতিমানবিক শক্তি আমার নাই। দুর্বলতম

মানুষের মত আমার ভুল করবার সম্ভাবনা আছে। আমার সেবা করবার শক্তি সীমাবদ্ধ।......ত্রুটি স্বীকার যেন এক প্রকার সমার্জ্জনী যাহার আঘাতে সকল মালিন্য দূর হয়। আমি ইহাতে আমাকে বেশী শক্তিমান মনে করছি।...বারদৌলির শান্তিময়তায় যদি চৌরী চৌরার একবিন্দু মৃত্যু হলাহল মিশে তাহা গ্রহণের অযোগ্য হবে।.. শান্তিপূর্ণ অনানুগত্যে কোন প্রকার উত্তেজনা থাকবে না। আইন অমান্য হল নীরব সহনের প্রস্তুতি। পূর্ব হতে বিধান না করলে ভারত হিংসার পথে যাবে। পুনরায় শান্তির আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন করতে হবে। গভর্ণমেণ্টের শত উস্কানি স্বত্বেও শান্তি অব্যাহত রাখতে হবে। এই বিষয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত থাকবে।"

প্রায়শ্চিত্তর বিষয়ে তিনি বলেন, "আমাকে ব্যক্তিগতভাবে শুদ্ধিলাভ ব। আবার নিজেকে যোগ্যতর যন্ত্র করে তুলতে হবে যাহাতে নৈতিক আবহাওয়ায় বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলে তা বুঝতে পারি। শুদ্ধির জন্য আমার পক্ষে অনশনের অপেক্ষা আর কিছুই উপকারী নাই। নিজের পূর্ণতর প্রকাশের জন্য দেহের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে অনশন করা যায় তাহা অপেক্ষা উন্নতির প্রবলতর বস্তু আর নাই। আন্দোলন যাহাতে সহিংস না হয় সেজন্য আমি মৃত্যুবরণ করতেও রাজি আছি"। তিনি দেশের সমস্ত দুর্বার শক্তিকে গতিশীল আন্দোলনের ঠিক আরম্ভের মুখে তিনবার বন্ধ করলেন। একে গান্ধীজীর দুর্বলতা ভেবে নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসী তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়। ইহাতে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যায়।

একনায়কত্বে বিতৃষ্ণা—১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেস গান্ধীজীর উপর সমস্ত কাজের দায়িত্ব ও তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ভার

অর্পণ করেন। তবে তিনি কংগ্রেসের জাতীয় আদর্শ পরিবর্ত্তন করতে বা সরকারের সঙ্গে কোন আপোষ করতে পারবেন না। কংগ্রেসের একদল অসহযোগী সহিংস উপায়ে স্বাধীনতা-অন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা প্রথমে আন্দোলন বন্ধের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু চাপে পড়ে তাঁরাও শেষে গান্ধীজীকে সমর্থন করেন। তিনি এইরূপে কৃত্রিম সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে খুব বিচলিত হন। তিনি লেখেন, "সচেতন ও অচেতন হিংসার ফল্গুস্রোত এতোই প্রবল যে আমি ভয়াবহ পরাজয়ের জন্য প্রার্থনা করছিলাম। আফ্রিকায় সংখ্যাল্পতার মধ্যে কাজ হয়েছিল। আমি সংখ্যাধিক্যকে বেশী ভয় করি। আমি বিচারবুদ্ধিহীন জনসাধারণের স্তুতিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তারা যদি আমার গায়ে থুতু ফেলে তবেই আমি বুঝব আমি কর্তব্যে অটল আছি। আমাকে সংশোধন করা অসম্ভব। জনসাধারণের ভুল আমি প্রত্যেক বারই স্বীকার কবতেই থাকব। আমার অন্তরের নীরব শান্ত বাণী ছাড়া আমি কারও কাছে মাথা নত করি না। মাত্র একজন সমর্থকেরও মধ্যে কাজ করার আমার সৎ সাহস আছে। বুঝেছি আমাদের অহিংস-বোধ গভীর নহে। আমরা ঘৃণায় জলে মরছি। আমরা যেন প্রতিশোধ নেবার আকাংখাকে বুকে লালন করছি। দুর্বলের চেষ্টাকৃত কৃত্রিম অহিংসা হতে কি স্বেচ্ছাকৃত অকৃত্রিম অহিংসার উদ্ভব হয়? যদি ক্ষিপ্ত আক্রোশ দেখা দিলেই নরনারী শিশু বিপন্ন হয়ে পড়ে তবে কি হবে? যদি বলপ্রয়োগ দ্বারা আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে চাই তবে আসুন আমরা অহিংসা ত্যাগ করে সাধ্যমত হিংসাত্মক উপায় গ্রহণ করি। তাহাই পুরুষের মত, সত্যের মত হবে। যাহারা সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাস করেন না তাদের কংগ্রেস হতে বিদায় লওয়া উচিৎ।" গান্ধীজী বুঝলেন কংগ্রেসের অনেকে অহিংসাকে সাময়িক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবেই

দেখছেন এবং তারা মনে করেন যে অহিংসা গোপনে হিংসার পথ পরিষ্কার করে দেবে।

কারাদণ্ড—গান্ধীজী দীর্ঘদিন ধরে গ্রেপ্তারের আশা করছিলেন এবং ভগবানের নিকট কাতরভাবে বন্দীত্বর কামনাও করছিলেন। তিনি মনে করেন, গ্রেপ্তার না হলে তাঁর পক্ষে লজ্জার ও লাঞ্ছনার বিষয় হবে। ১০ই মার্চ্চ গান্ধীজী গ্রেপ্তার হ'ন। তাঁকে কয়েকটি রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ লেখার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তিনি বিচারকের নিকট অকপটে সব দোষ স্বীকার করে বললেন, "আমি মাদ্রাজের গোলযোগ, চৌরী চৌরার দানবীয় অপরাধ, বোম্বাইএর উন্মত্ত অত্যাচার সব কিছুর জন্য দায়ী। আমি জানতাম যে আমি আগুণ নিয়ে খেলা করছি, তার বিপদের দায়িত্বও নিয়েছি। আমি মুক্তি পেলে আবার তাই করব। আমার নীতির প্রথম সূত্র অহিংসা, শেষ সূত্র অহিংসা। স্বদেশবাসীর উন্মত্ত কার্যের জন্য আমি গভীরভাবে দুঃখিত। আমি কঠোরতম শাস্তি চাই, করুণা চাই না। ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ভারত অনাহারে রয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, অধঃপাতে গিয়েছে। ইংলণ্ড ভারতের যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে পূর্বে কোন ব্যবস্থাই সেরূপ করে নাই। অমঙ্গলের সঙ্গে অসহযোগিতাই কর্তব্য। আমি এক নূতন অস্ত্র দিয়েছি। তাহা নূতন কিন্তু দুর্জয়। সে অস্ত্র অহিংসার।" বিচারে গান্ধীজীর ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয়। ইয়ং ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের এক বৎসর কারাদণ্ড হয়। গান্ধীজী কারাগারে উপাসনা করে নিজেকে শুদ্ধ করছিলেন। কারাগারে গান্ধীজী তাঁর অমূল্য গ্রন্থ আত্মজীবনী (Experiments with Truth) রচনা করেন। নভেম্বর মাসে কামালপাশা তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করেন। সুলতান মালটায় পালিয়ে যান। খিলাফত আন্দোলনের এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুক্তি—১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে বিপুল ভোটাধিক্যে গান্ধীজীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের, অসহযোগ আন্দোলনের ও পরিষদ বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু বিলাতি মাল বয়কটের প্রস্তাব বাতিল হয়। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে প্রথম খাদি প্রদর্শনী হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখা দেয় এবং কংগ্রেস স্বরাজী ও চরকাপন্থী দু'দলে বিভক্ত হয়। গান্ধীজী কারাগারে অন্যান্য বন্দীদের অপেক্ষা অধিক সুবিধা নিতে অস্বীকার করেন। ডিসেম্বরে কংগ্রেসের কোকোনদ অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণের ও আইন-অমান্যর প্রস্তুতির জন্য দেশকে আবেদন জানালেন। দেশবন্ধু সিরাজগঞ্জ প্যাক্ট করে মুসলমানদের সহযোগিতা ভিক্ষা করলে কোকনদ কংগ্রেস তাহা অগ্রাহ্য করে। এই সময় হিন্দুস্থান সেবাদল গঠিত হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীতে গান্ধীজীর Appendicitis অস্ত্রোপচার হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারীতে তাঁকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য জুহুতে গমন করেন। এই সময় পত্রালাপে বিখ্যাত মনীষী রোমাঁরোলার সহিত তাঁর বন্ধুতার সূত্রপাত হয়। এপ্রিল মাসে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়া ও নবজীবনের সম্পাদনা পুনরায় আরম্ভ করেন। এই সময় দিল্লী, নাগপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, কোহাট, লক্ষ্ণৌ, সাহাজানপুরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয় এবং গণ-আন্দোলন শিথিল হয়, ইংরাজ ব্যাঙ্গ হাসি হাসতে থাকে। গান্ধীজী এই সব হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট প্রস্তুত করলেন।

অনশন—কোহাটের হাঙ্গামার জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বরে গান্ধীজী একুশ দিনের জন্য মহম্মদ আলির গৃহে অনশন আরম্ভ করেন। অনশনের সমর্থনে তিনি বলেন, "আমি আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও দোষ দিই না"। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে বেলগাঁওতে গান্ধীজী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব

করেন এবং বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের উপর জোর দেন। এই সময়ে দেশবন্ধু দেশের সেবায় তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেন। বেলগাঁও কংগ্রেসের পর গান্ধীজী কিছুকাল সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে থাকেন এবং খদ্দর ও চরকা প্রচারে ব্রতী হন। এই বৎসর গান্ধীজী নিখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯২৫-১৯২৯ গান্ধীজী সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যে (খদ্দর প্রচার, অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও হিন্দু-মুসলমান মিলন) আত্মনিয়োগ করেন।

ভাইকম (ত্রিবাঙ্কুর) সত্যাগ্রহ—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভাইকম গ্রামে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নির্দেশে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। অবশেষে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশের ও রাস্তায় চলাচলের অধিকার দেন।

তৃতীয় ভারত-পরিভ্রমণ (১৯২৫)—তিনি কাথিয়াবাড়ে পরিভ্রমণ করে হরিজনদিগের প্রতি সাহানুভূতির জন্য বর্ণ হিন্দুদিগের নিকট আবেদন করেন। তিনি উত্তর ও পূর্ব বাংলা পরিভ্রমণ করে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যের জন্য আবেদন করেন। এই সময় দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়। তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের জন্য দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। তিনি মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও যুক্তপ্রদেশে গঠনমূলক প্রচার কার্য চালান। ২৪শে নভেম্বর হতে আশ্রমে দুর্নীতির জন্য তিনি সাত দিন অনশন করেন।

১৯২৬—১৯২৮—১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী চীন যাওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। তিনি তথায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন প্রয়োগের কথা চিন্তা করছিলেন কিন্তু নানা কাজের চাপে তাঁর তথায় যাওয়া ঘটে উঠল না। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে গৌহাটি কংগ্রেসে স্বাধীনতা-প্রস্তাবে গান্ধীজী বাধা দেন কারণ তখনও দেশ প্রস্তুত ছিল না। তিনি তিন মাস সিংহলে অতিবাহিত করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর সমর্থনে মাদ্রাজে

সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার অত্যাচারী ইংরাজ সেনাপতি নীলের মর্মর মূর্তি অপসারণের জন্য সত্যাগ্রহ হয় এবং শেষে কর্তৃপক্ষ এই মূর্তি অপসারণে বাধ্য হন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বরে সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন বোম্বাই পৌছায়। এই কমিশন স্থির করবেন ভারতকে কতটা শাসনভার দেয়া যায়। কিন্তু ইহাতে কোন ভারতীয় সভ্য ছিল না। সেজন্য সেদিন সারা ভারতে সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। 'সাইমান ফিরে যাও' বলে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। সরকার জুলুম করল। লাজপত রায়কে প্রাণ দিতে হল।

বারদৌলী সত্যাগ্রহ—গুজরাটের বারদৌলী তালুকে গভর্ণমেণ্ট শতকরা বাইশ টাকা খাজনা বৃদ্ধি করে। গান্ধীজীর নির্দেশে ও প্যাটেলের পরিচালনায় ছয় মাস যাবৎ কৃষকরা খাজনা বন্ধের জন্য সত্যাগ্রহ করে। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টও উৎপীড়ন সুরু করল। কৃষকরা দলে দলে কারাবরণ করল। তাদের সম্পত্তি ক্রোক ও বাজেয়াপ্ত হল। তাদের গো-মহিষাদি কসাইয়ের কাছে বিক্রি করা হল। শেষে ব্লমফিল্ড তদন্ত কমিটি রায় দিলেন যে, সরকারের এই খাজনা-বৃদ্ধি 'লুটের' সমান। তখন সরকার খাজনা-বৃদ্ধি মকুব করেন। সত্যাগ্রহের জয় হয়।

কংগ্রেসে দুই দল—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত নেহরু কমিটি ভারতে Dominion Statusই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র অনুমোদন করেন। নেতাজী ও জহরলালজী প্রভৃতি বামপন্থীদল ব্রিটীশের সহিত সম্পর্কশূন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী প্রস্তাব করেন, "যদি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সরকার নেহরু রিপোর্ট মানিয়া না লন অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-

শাসন না দেন তবে দেশ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবে।" গান্ধীজীর প্রস্তাব ৩৭৭ ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ইহার পর নেতাজী "স্বাধীনতা সঙ্ঘ" নামক পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই কংগ্রেসে গান্ধীজী নেতাজীর নেতৃত্বে বামপন্থীদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে বিচলিত হন। এই কংগ্রেসে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক জাতীয় পতাকা অভিবাদন করে।

গান্ধীজীর সমর্থনে জহরলালজী পরবর্তি কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য সভাপতি মনোনীত হন। ইহার পর থেকে জহরলালজী বামপন্থী দল হতে দক্ষিণপন্থী দলভুক্ত হন।এবং শেষ পর্যন্ত মহাত্মার ভক্ত শিষ্য থাকেন।

১৯২৯—এই বৎসরের প্রথমেই গান্ধীজী বিলাতে আমন্ত্রিত হন। তিনি বলেন, "আমি অন্তরের সাড়া পাচ্ছি না। সুতরাং আমার যাওয়া অসম্ভব। কংগ্রেস এখন আগামী বৎসরের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমার ভারত ত্যাগ করা অন্যায়।" গান্ধীজী ভারতের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বর্মার পথে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় বিদেশী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করার জন্য তাঁর এক টাকা জরিমানা হয়।

আরউইনের ঘোষণা—এপ্রিলে সাইমন কমিশনের কার্য শেষ হয়। বিলাতে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় হয় এবং উদারনৈতিক দল জয়লাভ করে। এই নূতন দলের নির্দেশে আরউইন ঘোষণা করেন, "ব্রিটিশ সরকার ভারতে প্রগতিশীল ও দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন।" এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার লণ্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। চার্চ্চিল গান্ধীজীকে 'অর্ধনগ্ন ফকির' বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন, "ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন দেওয়া

অপরাধ বলে গণ্য হবে।" এই ঘোষণার কথা আলোচনার জন্য দিল্লীতে সর্বদলীয় সভা হয়। গান্ধীজীর দল গোল টেবিল বৈঠক সমর্থন করে এক বিবৃতি দেন। নেতাজীর দল ইহার বিরোধিতা করেন। গান্ধীজী মিঃ জিন্না প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন দাবী করেন। বড়লাট কোন নিশ্চয়তা দিতে অসম্মত হন। নেতৃবৃন্দ হতাশ হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লাহোর কংগ্রেস—জহরলালজীর নেতৃত্বে লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্বয়ং গান্ধীজী। আরউইনের ট্রেণে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু কোন প্রকারে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। গান্ধীজী কংগ্রেস অধিবেশনে একটি সমবেদনাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নেতাজী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বয়কট করে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার এবং শ্রমিক, যুবকদিগকে সংঘবদ্ধ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উহা ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

১৯৩০—বড়লাট ২৫শে জানুয়ারী আইন সভায় বলেন, "আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন অবান্তর"। ইহার জবাবে গান্ধীজী লেখেন, "বড়লাটকে ধন্যবাদ; তিনি ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এখন আমরা ও ব্রিটিশরা ঠিক কি অবস্থায় আছি তাহা পরিষ্কার হল।" ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষিত হল। দেশের সকলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করলেন "অহিংস উপায়ে স্বরাজলাভের চেষ্টা করব।"

ডাণ্ডি অভিযান ও আইন-অমান্য আন্দোলন—গান্ধীজী গরীবের দেশে প্রথমে লবণ-আইন অমান্য করার সিদ্ধান্ত করেন। এই বিষয় A. I. C. C তে আলোচনা হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ২২শে মার্চ

গান্ধীজী বড়লাটকে এগার দফা সমন্বিত চরম পত্রে (পরে দেয়া হয়েছে) লেখেন, "প্রিয় বন্ধু, সমস্ত দেশটা একটা জেলখানা, ব্রিটিশের ইচ্ছাই হল আইন। অন্যায় দূর করার জন্য আপনি যদি ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন এবং আমার পত্র যদি আপনার মনে কোন সাড়া না জাগায় তবে আমি লবণ-আইন ভঙ্গ করব। ইহাকে পুণ্য কাজ মনে করি।" (বিলাতি লবণ সস্তায় বেচার জন্য দেশী লবণের উপরে কর বসান হয়। তখন বিনা শুল্কে লবণ তৈরি আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল। গরীব লোক সমুদ্রজল হতে সামান্য লবণও তৈরি করতে পারত না)। বড়লাট কেবল দুঃখ প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী লিখলেন, "আমি করজোড়ে রুটি চাইলাম, পেলাম প্রস্তর।" তিনি বাণী দেন, "আমাদের দাবি সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। সংগ্রামের পদ্ধতি নিষ্কলঙ্ক। যতদিন সত্যকে ও অহিংসাকে অনুসরণ করব ততদিন পরাজয় হবে না।" বিশ্বের বহুস্থান হতে গান্ধীজী এই অভিযানের সাফল্য কামনা করে বাণী পেলেন। ১২ই মার্চ্চ সকালে গান্ধীজী ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে সমুদ্রতীরস্থ ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করলেন। শপথ করলেন "হয় লবণ আইন উঠাব, না হয় আমার দেহ সাগর জলে ভাসবে।" দুই শত মাইল দীর্ঘ পথ ফুল পতাকায় সজ্জিত হয়ে উঠল। পথে অগণিত নরনারী নারিকেল, ফুল ও মালা দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল 'গান্ধীজী কী জয়!' অর্ধনগ্ন গান্ধীজী দীর্ঘ যষ্টি হাতে দৃঢ় নগ্নপদক্ষেপে তীর্থ যাত্রায় চললেন।

৬ই এপ্রিল তাঁরা ডাণ্ডিতে পৌছলেন। গান্ধীজী ৭ই এপ্রিল লক্ষ নরনারীর প্রার্থনা সভায় আব্বাস তায়েবজী ও নাইডুকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে সমুদ্রতীরে গিয়ে সকলে লবণ প্রস্তুত করলেন। গান্ধীজী দিনের পর দিন গ্রামে গ্রামে গিয়ে লবণ আইন ভঙ্গের বাণী প্রচার করলেন। ওয়ার্কিং কমিটি দেশময় আইন অমান্যর পরিসর বৃদ্ধি করেন। আরম্ভ হল

ভারতের সর্বত্র বিরাট লবণ-আইন ভঙ্গের, ট্যাক্স বন্ধের, রাজস্ব বন্ধের, বন-আইন ভঙ্গের অভিযান। সরকার ভীষণভাবে নির্যাতন আরম্ভ করলেন যার কাছে ডায়ারের অত্যাচার অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠল। গান্ধীজী দ্বিতীয় পত্রে বড়লাটকে জানান, "আমি ধরসনার লবণ গুদামে হানা দিবার অভিপ্রায় জানাচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা জলবায়ুর ন্যায় জনসাধারণের সম্পদ।" ইহার পর গভর্ণমেণ্ট সর্বত্র দমনমূলক ব্যবস্থা করলেন। বারটি বিশেষ আইন জারি হল। সর্বত্র পুরুষ-নারীর উপর লাঠি ও গুলি চলল। ১৩১ খানা কাগজের কাছ থেকে আড়াই লাখ টাকার জামিন আদায় হয়। ৪ঠা মে রাত্র ১২টায় পুলিশ সত্যাগ্রহ শিবিরে হানা দিয়ে তীব্র আলোকপাত করে গান্ধীজীর নিদ্রাভঙ্গ করল এবং প্রাতে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করল। বৃদ্ধ ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে ২৫০০ সত্যাগ্রহী ধরসনার লবণের ডিপোয় হানা দেয়। লাঠির আঘাতে একজন নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়। ইংরাজ রিপোর্টার বললেন, "ব্রিটিশের অত্যাচার দেখে আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। সত্যাগ্রহীদের অহিংসা দেখে মুগ্ধ হচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গে জহরলাল, মতিলাল, মালব্য, প্যাটেল প্রভৃতি বহু নেতাকে ও কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেসও বে-আইনী ঘোষিত হয়। এদিকে আন্দোলনও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। এই আন্দোলনে সবশুদ্ধ এক লক্ষ লোক অভিযুক্ত হয় তন্মধ্যে মুসলমান বার হাজার ছিল। পুলিশের গুলিতে ১০১ জন নিহত ও ৫০০ জন আহত হয়।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি—বিলাতে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর হতে পর বৎসর ১৯ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত চলে। ইহাতে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি না থাকায় ইহা ব্যর্থ হয়। সমস্ত নেতা কারারুদ্ধ থাকায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কোন অধিবেশন বসল

না। গভর্ণমেণ্ট দমননীতি অবলম্বন করেও আন্দোলন বন্ধ করতে পারলেন না। সাপ্রু প্রমুখ উদারনৈতিক দলের মধ্যস্থতায় বড়লাট আরউইন গান্ধীজী ও অন্য ত্রিশজন কংগ্রেস নেতাকে মুক্তি দেন—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে লন। আরউইন ও গান্ধীজীর মধ্যে পনর দিন যাবং বহু আলোচনার পর ৪ঠা মার্চ্চ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সর্ত্তগুলি এইরূপ :—বিদেশী দ্রব্য বয়কট বন্ধ করা হবে কিন্তু স্বদেশী গ্রহণের প্রচারকার্য্য চলবে। গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন। শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং চলবে কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত থাকবে। সমস্ত অডিন্যান্স তুলে নিতে হবে। রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। সমুদ্রতীরবাসী সকলে লবণ সংগ্রহ, লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করতে পারবে। নেতাজীর দল এই চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন। লবণ আইন ভঙ্গের জয় হল।

অহিংস বিপ্লবী ও গান্ধীজী—১৯২১এ এক বছরে স্বরাজ হবে—গান্ধীজীর এই প্রতিশ্রুতিতে বিপ্লবীরা আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে আপনাদের কর্মকাণ্ড স্থগিত রেখেছিল। কিন্তু এক বছরে স্বরাজ এল না, খিলাফত আন্দোলন বন্ধ হয়ে মুসলমানরা অসহযোগ ছেড়ে সরে পড়ল, সরকারের জুলুমও বেড়ে গেল এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দিল। এই সুযোগে নব বিপ্লবের "ইনকিলাব জিন্দাবাদ"এর ধ্বনিতে ভারত মুখরিত হ'ল। ভগৎসিংহ, বটুকেশ্বর, যতীন দাস, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি বিপ্লবীরা এই ধ্বনির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন।

করাচি কংগ্রেস—পাঞ্জাব পরিষদে বোমা নিক্ষেপের জন্য ভগৎ সিংএর ফাঁসির হুকুম হয়। নেতাজীর দল ভগৎ সিংএর ফাঁসির হুকুম মকুবের জন্য চুক্তি অনুযায়ী বড়লাটকে অনুরোধ করতে গান্ধীজীকে বলেন। পাঞ্জাব সরকারের ব্যাপার বলে বড়লাট সম্মত হন না। ইহাতে তরুণ

সম্প্রদায় তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। করাচিতে কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বেই ২৩শে মার্চ গোপনে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব সিংএর ফাঁসি হয়ে যায়। এতে সমস্ত দেশে আবার অসন্তোষের আগুণ জ্বলে উঠল। তরুণ সম্প্রদায় নবযুবান কনফারেন্স আহ্বান করলেন। করাচিতে গান্ধীজীকে তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁরা গান্ধীজীকে কাল পতাকা, কাল ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করে, তাঁর প্রতি ইষ্টকও নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি বললেন, "গান্ধী মরে যেতে পারে। কিন্তু গান্ধীবাদ চিরদিন বেঁচে থাকবে।" নবযুবান কনফারেন্সে চুক্তি অনুসারে তাঁর আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার নীতির নিন্দা করা হয়।

কংগ্রেস গান্ধীজীকে গোল টেবিল বৈঠকের একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ১৮ই এপ্রিল নূতন বড়লাট উইলিংডন কার্যে যোগ দেন। ১১ই জুলাই গান্ধীজী উইলিংডনকে চুক্তি অমান্যর জন্য দায়ী করেন। তিনি চুক্তি অনুসারে কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দেন। পুনরায় প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের দরুণ দেশে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিল। গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার নূতন চুক্তি সম্পাদন করলেন।

লণ্ডনে গান্ধীজী—গান্ধীজী ১২ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌছলেন। সেখানে তিনি East End অঞ্চলে মিস মুরিয়েল লিষ্টারের গৃহে অবস্থান করেন। এই অঞ্চলটা ছিল গরীব শ্রমিক অধ্যুষিত। হাজার হাজার দরিদ্র নরনারী তাঁর দর্শনপ্রার্থী হত। তিনি সামান্য খদ্দরের ধুতি চাদর পরে চপ্পল পায়ে দিয়ে মহামান্য সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এগার সপ্তাহের বৈঠকে কোন ফল হ'ল না। বৈঠকের শেষে তিনি বললেন. "বৈঠকের কি ফল হল বুঝলাম না। ভবিষ্যৎ কোন দিকে টেনে নিয়ে যাবে তাও বলতে পারি না।" তিনি হতাশ হয়ে ৫ই ডিসেম্বরে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। পথে তিনি প্যারিসে টেবিলের উপর উপবেশন করে এক বিরাট সভায় বক্তৃতা

দেন। সুইজারল্যাণ্ডে শ্রেষ্ঠ মনীষী রোমা রেঁালার সঙ্গে গান্ধীজী পাঁচদিন অতিবাহিত করেন। রোমাঁ রেঁালা গান্ধীজীর খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি গান্ধীজীর একখানি জীবনী রচনা করেন। রোমে গান্ধীজী মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সিরসি সত্যাগ্রহ (১৯৩১)—শস্যহানির দরুণ কর্ণাটকের সিরসি, সিন্দাপুর ও হিরেকেবুর তালুকে খাজনা মকুবের আবেদন সরকার অগ্রাহ্য করে। গান্ধীজীর অনুমোদন নিয়ে খাজনা বন্ধ আন্দোলন সুরু হয়। অমনি সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের উপর আরম্ভ হ'ল সরকারি জুলুম। তাদের সম্পত্তি ক্রোক ও বাজেয়াপ্ত চলতে লাগল। পরে সরকার কৃষকদের কিছু খাজনা মকুব করেন।

আইন-অমান্য আন্দোলন—১৯৩১ খৃষ্টাব্দ ২৮শে ডিসেম্বরে গান্ধীজী ভারতে ফিরলেন। ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীকে আবার সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিচালনার ভার দেন। বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকের অভিনয়ের সময় গভর্ণমেণ্ট সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলায় অর্ডিন্যান্স জারি করে এবং আবদুল গফুর খাঁকে, জহরলালকে ও ১০ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করে। গান্ধীজী এই জুলুমকে খৃষ্টান বড়লাটের বড়দিনের উপহার বলে ব্যক্ত করেন। গান্ধীজী ছয় দিন যাবৎ বড়লাটের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। বড়লাট বিশেষ আইন জারি ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে আলোচনা করতে বা গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন। কংগ্রেস নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আইন অমান্যর জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন এবং পৃথিবীর সমগ্র স্বাধীন জাতিকে ইহার গতি নিরীক্ষণ করতে অনুরোধ জানান। ৪ঠা জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, কিষাণসভা, ন্যাশন্যাল স্কুল বেআইনী ঘোষণা করেন। গান্ধীজী ও প্যাটেল গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদিগকে যারবেদা

কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়। সহস্র সহস্র কংগ্রেস কর্মী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গুজরাট, কর্ণাট ও বাংলায় কর বন্ধ আন্দোলন চলতে থাকে। ইংরাজ রাজকর্মচারির মারফত মুসলমান তরুণদের মধ্যে পৃথক জাতিতত্ত্বের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে যায়।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা—ইংরাজ Divide and rule এই নীতি অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করে আসছিল। হিন্দু, মুসলমান, তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে যত রকমে ভেদ সৃষ্টি করা যায়, ইংরাজ তার চেষ্টা করেছে। পূর্বে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন হয়। ১৭ই আগষ্ট প্রধান মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আইন সভায় বর্ণ হিন্দু ও তপশীল হিন্দুর পৃথক সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা হ'ল। গান্ধীজী প্রধান মন্ত্রীকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কারাগারেই আমরণ অনশনের সংকল্প জানান। প্রধান মন্ত্রী গান্ধীজীকে তপশীলদের প্রধান শত্রু বলে উল্লেখ করে অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। অনশনের উদ্দেশ্য ছিল বর্ণহিন্দুদের নিকট হতে তপশীলীদের জন্য সুবিধা দাবি করা, অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং বাটোয়ারা রদ করা।

অনশন—গান্ধীজী ২০শে সেপ্টেম্বর অনশন আরম্ভ করেন। পাঁচ দিন যাবৎ নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলল। মন্দির প্রভৃতি অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত হতে লাগল। অস্পৃশ্য বা তপশীলী কথার পরিবর্তে 'হরিজন' (হরির আপন জন) কথা ব্যবহৃত হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বরে হরিজন, বর্ণ-হিন্দু ও কংগ্রেসের মধ্যে বিখ্যাত **পুণা-চুক্তি** স্বাক্ষরিত হয়। সর্ত হয়—হরিজনরা পৃথক নির্বাচন দাবি প্রত্যাহার করবে এবং বর্ণ-হিন্দুরা এদের জন্য কয়েকটি রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করবে। ২৬শে সেপ্টেম্বরে একটি সরকারি ইস্তাহার তাঁকে দেওয়া হয়।

ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে অনশন ত্যাগ করেন। ২৬শে ডিসেম্বরে কর্তৃপক্ষ কারাগারে আপ্পাসাহেবকে ঝাড়ুদারের কার্য করবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। গান্ধীজী ইহার প্রতিবাদে দুই দিন অনশন করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারীতে হরিজনদিগের জন্য গুরুবায়ুর মন্দির উন্মুক্ত করবার দাবিতে তিনি অনশনের সংকল্প করেন। কিন্তু অধিক সংখ্যক অধিবাসী মন্দির প্রবেশের পক্ষে মত দেওয়ায় তিনি এই অনশন করেন না। ফেব্রুয়ারী মাসে **হরিজন সেবক-সংঘ** গঠিত হয় এবং 'হরিজন পত্রিকা' প্রকাশ সুরু হয়। ৮ই মে হরিজনদের অধিকার সম্বন্ধে বেশী সজাক হবার জন্য নিজের ও সহকর্মীদের চিত্তশুদ্ধির জন্য তিনি কারাগারে একুশ দিনের জন্য অনশন আরম্ভ করেন। এই দিনই তিনি কারামুক্ত হ'ন। তিনি কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আইন অমান্য আন্দোলন ছয় সপ্তায় পিছিয়ে দেন। ২৯শে মে তিনি অনশন ত্যাগ করেন। বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ-প্রার্থী হলে বড়লাট অসম্মত হন; ব্যাপকভাবে না করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আরম্ভ হয়। যাহারা আন্দোলনে যথাসর্বস্ব হারিয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে তিনি সবরমতী আশ্রম তুলে দেন। তিনি কয়রা জেলায় ব্যক্তিগত আন্দোলনের কথা ঘোষণা করায় তাঁকে ও আশ্রমের ৩০ জনকে সবরমতী কারাগারে আটক রাখা হয়। ৪ঠা আগষ্ট তাঁর এক বৎসর কারাদণ্ড হয়। কারাগারে তাঁকে হরিজনদের জন্য কাজ করবার সুবিধা দেওয়া হয় না। ইহার প্রতিবাদে তিনি ১৬ই আগষ্ট অনশন আরম্ভ করেন। ২৩শে তাঁকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ১৯৩৩ সালের মে হইতে ১৯৩৪ সালের জুলাই পর্যন্ত চলে। ১৯৩৪ সালের প্রথমে গান্ধীজী ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বিহারে গমন করেন। এই সময়ের মধ্যে বেশীর ভাগ রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পায়।

চতুর্থ ভারত-পরিভ্রমণ (১৯৩৩):—হরিজন উন্নয়নের জন্য গান্ধীজী ৭ই নভেম্বর চতুর্থবার ভারত পরিভ্রমণ করেন। দিল্লী, বেরার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, কেরল, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের নগর ও জনপদে তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান করে বেড়ালেন। কোথাও দেখা গেল তিনি হরিজন-শিশুকে আদর করছেন, কোথাও বা হরিজন ছাত্রাবাসের হিসাব সংশোধন করছেন; বক্তৃতা, হরিজন তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, তাঁকে প্রদত্ত উপহার দ্রব্যের প্রকাশ্য নিলাম-বিক্রয়,—সর্বত্র ঘুরে ঘুরে এই কাজই করলেন।

বিহার-পরিভ্রমণ (১৯৩৪):—বিহার ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হওয়ায় গান্ধীজীর দৃষ্টি এই প্রদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে কর্ম ও প্রকৃত শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করা। তিনি সকলকে বললেন,—'কাজ কর, কাজ কর! ভিক্ষা কর না, কেবল কাজ কর।' ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই মে হইতে দশমাস তিনি এইরূপ পদব্রজে হরিজন সংগঠনের জন্য ভারত পরিভ্রমণ করেন।

অনশন—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট গান্ধীজী জনৈক সহকর্মীর অহিংস কার্য্যের প্রতিবাদে সাতদিন অনশন করেন। তিনি অনুভব করেন যে তিনি দুর্বল; আত্মবিচারের জন্য তাঁর অনশনের প্রয়োজন।

কংগ্রেসের কাজে অসন্তুষ্টি—গান্ধীজী বুঝতে পারেন—"কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা নিয়মতান্ত্রিক হ'তে চায়; সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা স্বরাজ দল তৈরী করেছে। যাঁরা কর্মিস্তর থেকে না উঠে হঠাৎ নেতা হতে চায় তাঁদের দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্ভব হবে না। মুসলমানরাও সংগ্রাম বর্জন করেছে।" কাজে ভেজাল থাকাতে সত্যাগ্রহের পূর্ণ বাণী জনসাধারণ পায় নি। তিনি সংগ্রামের সফলতার জন্য গণ-সংগঠন করতে মনস্থ করেন।

প্রাণনাশের চেষ্টা—পুণায় গান্ধীজীর হরিজন সফরের সময় হরিজন বিরোধী বর্ণ-হিন্দুদের প্ররোচনায় একব্যক্তি জনসভায় বোমা নিক্ষেপ কোরে গান্ধীজীর জীবন নাশের চেষ্টা করে। ফলে সাত ব্যক্তি আহত হয় কিন্তু ভাগ্যক্রমে গান্ধীজীর জনসভায় আসতে একটু বিলম্ব হওয়ায় তিনি বেঁচে যান। গান্ধীজী বলেন, "ইহাতে স্থির মস্তিষ্ক সনাতনীদের কোন প্ররোচনা আছে বলে আমার মনে হয় না। সনাতনীদের সংযত ভাষা ব্যবহার করতে অনুরোধ করি।...জীবনাহুতির দ্বারা প্রত্যেক ব্রতই আরও অগ্রসর হয়, অবশ্য শহীদের গৌরব লাভ করবার আমার আগ্রহ নাই। হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য জীবনাহুতি দিতেও আমি প্রস্তুত। হরিজনদের জন্য জীবনাহুতি দিতেও আমি প্রস্তুত—এই শপথ আমি গ্রহণ করেছি।" ইহার পনর দিন পর আবার তাঁকে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করা হয়।

কংগ্রেস ত্যাগ—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টম্বর বোম্বাই এর অধিবেশন ত্যাগ করে গান্ধীজী বাহির হয়ে আসেন। তৎপর তিনি কংগ্রেসের চারি আনা সদস্য পদ ত্যাগ করেন কারণ কংগ্রেস 'শান্তিপূর্ণ ও আইন সম্মত' কথার পরিবর্ত্তে 'সত্য ও অহিংসা' কথা ব্যবহার করতে রাজি হয় না। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে সকলেই স্তম্ভিত হন কারণ গান্ধীজীই বর্তমান কংগ্রেসের স্রষ্টা ও পরিচালক। তিনি কংগ্রেসের বাহিরে থেকে দেশের সেবা করতে চান। কংগ্রেসের সদস্য পদ ত্যাগ করলেও তিনি মৃত্যু পর্যন্ত দেশের রাষ্ট্রগুরু ছিলেন। তাঁর পরামর্শ ব্যতীত কংগ্রেসের কোন প্রস্তাব রচিত হত না।

ওয়ার্ধা আশ্রম—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট ভারত-আইন সম্রাটের সম্মতি লাভ করে। এই আইনে ভারতবাসিকে আসল ক্ষমতা না দেওয়ায় ওয়ার্কিং কমিটি এই আইন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ৬ই জুন বড়লাট

গান্ধীজীর কোয়েটা যাবার অনুমতি অগ্রাহ্য করেন। কোয়েটায় তখন সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল ছিল। তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য যেতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী ২১শে মার্চ হইতে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত চার সপ্তাহ মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তিনি মনে করতেন, "মৌনব্রত অবলম্বন করলে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।" তিনি তখন থেকে আমৃত্যু প্রতি সোমবার মৌন অবলম্বন করেন। ২২শে অক্টোবর তিনি ওয়ার্ধার নিকটবর্তি সেবাগ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। মীরা বেন (গান্ধীজীর আমেরিকান শিষ্যা মিস শ্লেড্) আশ্রমের তত্ত্বাবধানের জন্য তথায় প্রেরিতা হন।

গ্রামোন্নতি—১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে জাপানী কবি নোগুচি সেবাগ্রামে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কবি গান্ধীজীকে জাপান পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত করেন। পৃথিবীর অনেক স্থান হতে আমন্ত্রিত হ'লেও তিনি ভারতের সেবা ছেড়ে বাহিরে কোথাও যাননি। এই বৎসরে তিনি লক্ষ্নৌতে ও ফৈজপুরে খাদি ও কুটির শিল্প প্রদর্শনী এবং মে মাসে গ্রাম-সেবকদের শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। তিনি গ্রামোন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন কারণ তিনি বুঝতে পারেন গ্রাম গুলিই ভারতের প্রাণ। তাঁর অষ্টাদশ কর্মসূচীর মধ্যে গ্রামের সেবাকার্যই বিশেষ স্থান লাভ করে। তিনি জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ—হরিজনদিগের প্রতি মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পর গান্ধীজী ত্রিবাঙ্কুর পরিদর্শন করেন। তাঁর প্রভাবে নাম্বুদ্রিরাও মন্দির-দ্বার হরিজনদিগের প্রতি উন্মুক্ত করে। ভারতে ইহার ফল সুদুর প্রসারী হয়। অনেক স্থলেই এইরূপ মন্দির দ্বার হরিজনদিগের প্রতি উন্মুক্ত হয়। নির্বাচনের ফলে এগারটির

মধ্যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যাধিক্য স্থাপিত হয়। গান্ধীজীর বিবৃতি ও পরামর্শ অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহাতে দেশে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। গান্ধীজী মন্ত্রীসভাকে নির্দেশ দেন :—গণ সংগঠনে দৃষ্টি দাও, মদ্য-পান নিবারণ কর, কিষাণদের অবস্থার উন্নতি কর, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার কর, কারাগারগুলিকে স্বভাব শোধনের আগারে পরিণত কর। ওয়ার্ধা শিক্ষা সম্মেলনে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার দফাগুলি পেশ করেন। এই সময় কংগ্রেসের শাসনের সুযোগ নিয়ে চরমপন্থীরা নিজেদের সংগঠন করতে লাগল। মুসলমান গণ-সংযোগের চেষ্টা চলায় লীগ ক্ষিপ্ত হয়। মিঃ জিন্না বললেন "কংগ্রেস ফ্যাসিবাদের ধাক্কা খেয়ে সাম্প্রদায়িক মিলনের আশা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে।"

রাজবন্দীদের মুক্তির আন্দোলন—গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১লা এপ্রিল রাজবন্দী-মুক্তির জন্য তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন শত শত রাজবন্দী বিভিন্ন কারাগারে আবদ্ধ ছিল। তিনি এই সম্পর্কে ২৬শে অক্টোবর হতে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং বাংলার লাটের সঙ্গে ও বিভিন্ন জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইহার প্রতিবাদে একদিন অনশনও করেন। এই আলোচনার ফলে বাংলা সরকার প্রথম কিস্তিতে ১১০৭ জন রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে গান্ধীজীর রক্ত-চাপ বৃদ্ধি পায়। তৎসত্ত্বেও তিনি বন্দীমুক্তির জন্য ১৬ই মার্চ হইতে ১৩ই এপ্রিল পুনরায় কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং গভর্ণরের ও আন্দামান বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অধিকাংশ বন্দী আর হিংসাত্মক কার্য কলাপ করবেন

না—গান্ধীজীর নিকট এই প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি এই বিষয়ে মন্ত্রীদের কার্য্যে গভর্ণরের হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানান। এপ্রিল মাসে তিনি তাঁর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইকে সীমান্ত প্রদেশে পাঠান। তিনি নিজে মে মাসে এই প্রদেশ পরিদর্শন করলে পাঠানরা তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানায়।

রাজকোটে সত্যাগ্রহ—গান্ধীজী শুধু ব্রিটিশ ভারতে তাঁর কর্মধারা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির স্বেচ্ছাচার মূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তাঁরই নির্দেশে বহু দেশীয় রাজ্যে অহিংসা আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী রাজকোট রাজ্যের প্রজাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর এজেণ্টের হস্তক্ষেপের নিন্দা কোরে এক প্রবন্ধ লেখেন। কস্তুরীবাই আইন ভঙ্গ করবার জন্য রাজকোটে প্রবেশ করেন। সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে রাজকোটে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়। কস্তুরীবাই গ্রেপ্তার হ'ন এবং দাঙ্গা আরম্ভ হয়। বহুলোক সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়। জনতা হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়ায় গান্ধীজীর নির্দ্দেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হয়। গান্ধীজী শান্তির বাণী নিয়ে রাজকোটে গমন করেন। রাজ্যের শাসন সংস্কার সম্পর্কে প্যাটেলের সঙ্গে রাজা ঠাকুর সাহেবের পূর্বে একটি চুক্তি হয়েছিল। গান্ধীজী ঠাকুর সাহেবের বিরুদ্ধে এই চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনেন এবং প্রতিবাদে ৩রা মার্চ অনশন আরম্ভ করেন। ৪ঠা মার্চ তিনি এই ব্যাপারে বড়লাটের হস্তক্ষেপ অনুরোধ করে পত্র দেন। বড়লাট স্যার মরিস গায়ারের দ্বারা সালিশীর প্রস্তাব করায় গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের অবস্থা ব্রিটিশ প্রজাদের অবস্থা অপেক্ষাও খুবই শোচনীয় ছিল। শাসন সংস্কারে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা ও একাধিপত্য বজায় থাকত।

শাসনকার্যে প্রজাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। রাজকোটের ঘটনা থেকে দেশীয় রাজ্যগুলিতে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়।

ত্রিপুরী কংগ্রেস—১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করায় দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে এই মতভেদ অধিক তীব্র আকার ধারণ করে। নেতাজী ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। পুনরায় নেতাজী তাঁর নির্বাচিত ওয়াকিং কমিটির সদস্যগণের বিরোধিতা স্বত্বেও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সীতারামিয়াকে সভাপতি নির্বাচনে পরাজিত করেন। এই নির্বাচন বিষয়ে গান্ধীজী একটি বিবৃতি দেন, "আমি গোড়া হতেই সুভাস বাবুর নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। কারণ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পট্টভি নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করেননি। এই পরাজয় তাঁর অপেক্ষা আমারই অধিক। সংখ্যালঘুরা যখন সহযোগিতা করতে অসমর্থ হবেন তখন তাঁরা সহযোগিতা হইতে বিরত হবেন তবে তাঁরা কোন বাধা সৃষ্টি করবেন না"। এই বিবৃতির পরই বার জন সদস্য ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। নেতাজী নিউমোনিয়া রোগে শয্যাগত হয়েও সভাপতিত্ব করবার জন্য ত্রিপুরী গেলেন। সেখানে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির (A. I. C. C) সভায় গান্ধীজীর প্রতি ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ওয়াকিং কমিটির প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে গান্ধীজীর পরামর্শে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনেও এই প্রস্তাবগুলি গ্রহীত হয়। নেতাজী কয়েকবার গান্ধীজীর নিকট এসে কমিটির সদস্য নির্বাচনে ও কংগ্রেসের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য পরামর্শ চাইলেন। গান্ধীজী

এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। নেতাজীর আপোষের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হ'ল। তৎপর নেতাজী ২৯শে এপ্রিল কলিকাতায় A. I. C. C. সভায় পদত্যাগ করে কংগ্রেসের সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং Forward Bloc নামক দল গঠন করেন। এইরূপে কংগ্রেসের দুই দলের বিরোধের যবনিকা পতন হয়। গান্ধীজী পুনরায় সীমান্ত সফর করিয়া লোলা কোর্ত্তা বাহিনীর মধ্যে অহিংসার বাণী প্রচার করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশের পরাধীন দেশ সেজন্য ভারতবর্ষ যুদ্ধের প্রভাব থেকে রেহাই পায় নাই। ব্রিটিশের যুদ্ধ ঘোষণার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ভারত সরকার ভারতরক্ষা আইন প্রবর্তন করেন। যুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ না থাকলেও ভারতীয় কোন নেতার সহিত পরামর্শ না করে বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র পরিষদের কোন মত না নিয়ে ভারত সরকারও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ভারতকে যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করান হয়।

১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঘোষণা করবার এবং অবিলম্বে ভারতে জাতীয় সরকার গঠন করবার দাবি জানায়। বড়লাট স্বাধীনতার দাবি অগ্রাহ্য করে বিবৃতি দেন, "যুদ্ধাবসানের পর যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের শাসনতন্ত্রের কথা বিবেচনা করা হবে।" কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর সমর্থনে এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় প্রলুব্ধ না হয়ে ১০ই অক্টোবর যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সঙ্গে অসহযোগ করিবার সিদ্ধান্ত করে এবং প্রথম স্তর হিসাবে প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেসী মন্ত্রীগণকে পদত্যাগ করতে

নির্দেশ দেয় এবং অসহযোগ আন্দোলনকে অহিংস রাখতে অনুরোধ করে। ২রা নভেম্বর গান্ধীজী, মিঃ জিন্না ও পণ্ডিত নেহেরু বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একান্ত আপোষের সব আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গান্ধীজী বলেন, "ইংলণ্ডের প্রতি আবার নিজের সহানুভূতি আছে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা প্রথমে চাই।" ৪ঠা নভেম্বর গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে বলেন, "কংগ্রেসের পক্ষে মিঃ জিন্নার তুষ্টি সাধন করা অসম্ভব।" ৮ই নভেম্বর কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ কোরে তৎ তৎপ্রদেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। ইহার ফলে ভারতে যুদ্ধ প্রচেষ্টা খুব ব্যাহত হয়।

নূতন আলোকের সন্ধান—গান্ধীজী ২রা ফেব্রুয়ারী কবিগুরুর সহিত সাক্ষাৎ কোরে যুদ্ধে অসহযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর খদ্দর প্রচলনের সাফল্য সম্বন্ধে ও অসহযোগ আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। কয়েকটি পত্রে গান্ধীজীর অকাট্য যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী পুনরায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন কিন্তু কোন শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক মীমাংসার ভরষা পান না। এই সমস্ত আলোচনার ফলে যুদ্ধে ব্রিটিশের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর সংশয় বিদূরিত হয়। তিনি যুদ্ধ-পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য নূতন আলোকের সন্ধান করতে লাগলেন।

রামগড়—৩রা মার্চ (১৯৪০) কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়, "যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা না করে তবে কোন লোক অর্থ, সৈন্য বা সম্পদ দিয়ে যুদ্ধে সহযোগিতা করবে না।" গান্ধীজী প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটিকে সত্যাগ্রহ কমিটিতে রূপান্তরিত করবার নির্দেশ দেন। সর্ত হয় যে প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকে

অহিংস হতে হবে, চরকায় সূতা কাটতে হবে, কারাবরণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলন একটা হুজুক নয়, তাতে চাই সর্বস্ব ত্যাগ, চাই জীবনাহুতি।

গান্ধীজী ও কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ—গান্ধীজী কোন অবস্থাতে এমন কি জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতেও সহিংস নীতি অবলম্বন করতে রাজি নন। অহিংস সম্বন্ধে তরুণদের সঙ্গে তার মতভেদ হয়। ২১শে জুন (১৯৪০) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব করে, "গান্ধীজীকে স্বাধীনভাবে তাঁর অহিংস নীতির মহান আদর্শ অনুসরণ করবার সুযোগ দেওয়া উচিৎ। অতএব ভারতের বর্তমান অবস্থায় এবং ভবিষ্যতে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সময় কংগ্রেস যে কার্যক্রম অবলম্বন করবে তার দায়িত্ব হইতে ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীকে অব্যাহতি দিয়েছেন।" ৭ই জুলাই কংগ্রেস কমিটির দিল্লী অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয়, "বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধে অহিংস সংগ্রাম যথেষ্ট নয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিলে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করলে কংগ্রেস কেন্দ্রে ও প্রদেশে দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ ও আভ্যন্তরীণ শান্তির ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রয়োজন হলে হিংসানীতি অবলম্বন করতেও রাজি হয় যেটা গান্ধীজী অনুমোদন করেননি। এই প্রস্তাব পুনায় A. I. C. C. অধিবেশনে অনুমোদিত হয়।

গান্ধীজীর যুদ্ধ বিরোধী প্রচার কার্য—এই সময় ইউরোপীয় যুদ্ধে মিত্রপক্ষ ভীষণভাবে পরাজিত হ'তে থাকে। বড়লাট ৮ই আগষ্ট (১৯৪০) ঘোষণা করেন—তিনি শাসন পরিষদে (Executive Council) আরও কয়েকজন ভারতীয় সদস্য নির্বাচন করবার ক্ষমতা পেয়েছেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কারণ এইরূপ পরিষদ সম্প্রসারণেও প্রকৃত ক্ষমতা বড়লাটের হাতেই থাকবে। ভারতবাসীরা কেবল সাম্রাজ্যবাদের

জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেবে। ইহা কেবল ভারতবাসীকে স্তোকবাক্য দেওয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথাও কংগ্রেস ভোলে নি। বড়লাটের এই বিবৃতিতে কংগ্রেস ব্রিটিশের প্রচ্ছন্ন মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পারে যে ভারতবাসীর সাহায্যে যুদ্ধে জিতে ভারতে ব্রিটিশের প্রভুত্ব কায়েম করা। ১৫ই সেপ্টেম্বরে বোম্বাইর A. I. C. C. অধিবেশনে কংগ্রেস টালমাটাল অবস্থা কাটিয়ে কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মন স্থির করল। এখানে পুণার সহিংস প্রস্তাবের সমাধিলাভ ঘটে এবং কংগ্রেস অহিংস নীতিতে ফিরে আসে। গান্ধীজীর হাতে পুনরায় কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। গান্ধীজী বড়লাটের নিকট স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধে বিরোধী প্রচার কার্য চালাবার, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতের কোন স্বার্থ নাই—এই কথা বুঝিয়ে বলবার অধিকার দাবী করেন। বড়লাট যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে এই অজুহাতে এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। ওয়াকিং কমিটির অনুমোদন নিয়ে গান্ধীজী ১৩ই অক্টোবর (১৯৪০) এক একটি নির্দ্দিষ্টস্থানে যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে গান্ধীজীর নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ সুরু করেন। প্রথম সত্যাগ্রহীর গৌরব লাভ করলেন বিনোদা ভাবে। তাঁর কারাদণ্ড হ'ল। একের পর এক ওয়াকিং কমিটির সভ্যগণ, বহু নেতা বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী, পরিষদের সভ্য যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে কারাবরণ করেন। জহরলালের চার বৎসর ও মৌলানা আজাদের দেড় বৎসর কারাদণ্ড হয়। মার্চ্চ (১৯৪১) পর্যন্ত পাঁচ হাজার সত্যাগ্রহীর কারাবরণ করেন। ১০৪১ খৃষ্টাব্দের সারা বৎসর এই আন্দোলন চলল। কংগ্রেস কমিটি সত্যাগ্রহীদের তালিকা প্রস্তুত করে এক এক জনকে বক্তৃতা দিবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এই আন্দোলনের দ্বারা ভারতীয়দের যে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহানুভূতি নাই—এই কথা জগৎ জানতে পারে।

ক্রীপস প্রস্তাব—১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে জাপান অকস্মাৎ পার্ল-হারবার আক্রমণ কোরে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ফেব্রুয়ারীতে (১৯৪২) সিংহাপুরস্থ দুর্ভেদ্য ব্রিটিশ নৌঘাঁটির পতন হয়। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের একটির পর একটি দেশ মিত্রপক্ষের হস্তচ্যুত হওয়াতে ভারতবর্ষ মিত্রপক্ষের প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষেও যুদ্ধের কৃষ্ণছায়া ঘনীভূত হয়ে আসে। এই সময় ইউরোপেও মিত্র-পক্ষের যুদ্ধের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। ভারতে অপরিমেয় লোকবল, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু ভারতীয়বাসীর স্বেচ্ছাকৃত ও আন্তরিক সাহায্য ব্যতীত এই সামগ্রিক যুদ্ধে জয়ের কোন আশা নাই—ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এই পরম সত্য উপলব্ধি করেন। ১১ই (১৯৪২) মার্চ পার্লামেণ্টে এই উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতিতে মন্ত্রীসভার কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। মার্চ্চের মাঝামাঝি বিখ্যাত আইনজীবি ক্রীপস্ এই সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার জন্য ভারতে আসেন। প্রস্তাবের সর্তগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—

(ক) যুদ্ধাবসানের পর যত শীঘ্র সম্ভব Dominion শাসনতন্ত্র দেওয়া হবে। কিন্তু কংগ্রেস যুদ্ধকালেই পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। (খ) যুদ্ধের পর একটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করবে। সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হবে। যদি কোন প্রদেশ বা রাজ্য পৃথক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করতে চায় সে স্বাধীনতা দেওয়া হবে অর্থাৎ প্রস্তাবে ভারতকে বিভক্ত করে দুই সাম্প্রদায়িক রাজ্য প্রতিষ্ঠার অবকাশ দেওয়া হবে। (গ) যুদ্ধাবসান পর্যন্ত বর্তমান শাসনতন্ত্র প্রচলিত থাকবে; বড়লাটের Veto ক্ষমতা সংকুচিত করা, নিয়মতান্ত্রিক (Constitutional) গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপন্ন Cabinet এর মত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হবে না। কংগ্রেস দাবি করেছিল, "বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের

সম্মিলিত প্রতিরোধের পশ্চাতে জাতীয় ভাবধারার অনুপ্রেরণা থাকা চাই। সকলে উপলব্ধি করুক তাহারা জাতীয় নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে, দেশ তাদের, দেশ রক্ষার দায়িত্বও তাদের।" কিন্তু ক্রীপস্ প্রস্তাবে বলা হয় সমস্ত দল সম্মিলিত ভাবে দাবি করলেও ভারত রক্ষার ভার ভারতবাসীকে দেওয়া হবে না। ইহাতে ভারতীয়দের উপর অবিশ্বাস ও সাম্রাজ্য রক্ষার সতর্কতা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক নেতা, কংগ্রেস, মসলেম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি প্রত্যেক দল কর্তৃক ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। গান্ধীজী এই প্রস্তাবকে হাস্যকর, গ্রহণের অযোগ্য ও post dated cheque (ভবিষ্যতে পালিত হবে এমন এক প্রতিশ্রুতি) বলে বর্ণনা করেন।

"ভারত ছাড়" নীতির উৎপত্তি—ক্রীপস প্রস্তাবের ব্যর্থতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে যায় এবং ভারতবাসীরা ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছায় সন্দিহান হয়ে উঠে। ভারতের সর্বদলের মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটি অপ্রীতিকর অসহযোগের ভাব জেগে উঠে। ভারতের প্রতি ব্রিটিশের অবিশ্বাসজনিত আচরণে গান্ধীজীর মন গভীর দুঃখে পূর্ণ হয়। এই সময়ে গান্ধীজীর মনে চিন্তার পর চিন্তার স্রোত আসতে থাকে। অকস্মাৎ তিনি অন্তরে নূতন আলোকের সন্ধান পেলেন। তিনি নূতন সামরিক পরিস্থিতিতে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের দাবির যৌক্তিকতা গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি এই যুক্তিগুলি নানা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন। গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' নীতির যুক্তিগুলি তাহার নিজের কথায় অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।

(১) **"নৈতিক সাহায্য অস্বীকার**—ভারতের প্রতি ব্রিটেনের আচরণে আমার মন গভীর দুঃখে পূর্ণ হয়েছে। ক্রীপস প্রস্তাবে নীতির দিক থেকে ব্রিটেন অন্যায় করেছে। সুতরাং আমি ব্রিটেনের পরাজয় বা

মানব দুঃখে চিন্তাক্লিষ্ট মহাত্মা

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী

অবনতি কামনা না করলেও আমার মন ব্রিটেনকে যুদ্ধে নৈতিক সাহায্য দান করতে অস্বীকার করছে ।"

(২) "**ভারতে বিদেশী সৈন্য ক্ষতিকর**—আমি ভারতে অগণিত ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্য আমদানিকে নির্বিকার চিত্তে দেখতে পারি না। ভারতে কোটি কোটি লোকের মধ্য থেকে কি অগণিত সৈন্য শিক্ষিত করা যায় না? ইহার ফলে ভারতে আমেরিকার প্রভাব বিস্তৃত হবে। যুদ্ধের পরে দুই শক্তির—ব্রিটিশ ও আমেরিকার শোষণ চলবে। এই সকল যুদ্ধ-আয়োজনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার কোন আভাষ দেখছি না। যুদ্ধের আয়োজন নিছক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষারই আয়োজন। ব্রিটিশের পক্ষে প্রাচ্যকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যুদ্ধ করা বেশী বীরত্বব্যঞ্জক কাজ হবে। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী পাপের শাস্তি দেবার জন্য ভগবানের অভিশাপ রূপে নাজি শক্তির অভ্যুদয় হয়েছে। ব্রিটিশ শক্তির সময়মত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ অপসারণের উপর ভারতের ও ব্রিটেনের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠদের কাল্পনিক ভেদ স্বাধীনতার অরুণোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অদৃশ্য হবে। কোটি কোটি ভারতবাসী তখন এক অখণ্ড মানব সত্তায় পরিণত হবে।"

(৩) "**ইংরাজকে তাড়াইতে জাপ সাহায্য নেব না**—আক্রমণকারী কখনও হিতকামী হতে পারে এক কথা ভাবা নির্বুদ্ধিতাসূচক। জাপানীরা ব্রিটেনের শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে পারে কিন্তু সে কেবল ইংরাজের শৃঙ্খলের পরিবর্তে নিজের শৃঙ্খল পরাতে। ব্রিটিশ শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে আমাদের কোন শক্তির সাহায্য লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই পন্থা অহিংসার পরিপোষক হবে না। অহিংসা মতবাদে আমার অবিচলিত আস্থা আছে।"

(৪) "**ব্রিটিশের উপস্থিতি**—আমার নির্ভুল ধারণা যে ব্রিটিশের

উপস্থিতিই জাপানীদের ভারত আক্রমণে উত্তেজনা দিচ্ছে। ব্রিটিশরা ভারত ছাড়লে জাপানীরা তাদের কর্মপদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করবে সম্ভবতঃ ভারতের সহিত মিটমাট করবে। ভারতীয়দের প্রচ্ছন্ন ঘৃণার ভাব বিদূরিত হবে। ভারতের শ্বাসরোধকারী অস্বাভাবিক অচল অবস্থারও অবসান হবে।"

(৫) "পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য এবং নাজিবাদ ও ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের জন্য 'ভারত ছাড়' পদ্ধতি আবশ্যক। যুদ্ধের ঘোষণায় ভারতবাসীকে পরামর্শ করা হয় না। লোককে নানাপ্রকারে যুদ্ধের জন্য কর দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। স্বেচ্ছাকৃত দান ছাড়াও ভারত আতঙ্কজনক সংখ্যায় অর্থ দিচ্ছে। বিজেতাকে যে দান করা হয় তাহা কখনও স্বেচ্ছাকৃত নহে। ব্রিটিশরা জয়লাভের অধিকারে (right of conquest) দখলকারী সৈন্য দ্বারা ভারতকে পদানত করে রেখেছে। ব্রিটিশ শক্তি সর্বদাই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। সৈন্যরা বাস্তুভিটা দখল করছে। বিনা নোটিসে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। ভারতের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিনকে যুদ্ধে জিততেই হবে। ইহা কি করা উচিত? প্রত্যেক ভারতবাসীই অসন্তুষ্ট। এইরূপ সর্বব্যাপক অবিশ্বাস জীবনকে অপদার্থ করে তোলে। আমি দেশবাসী কাহারও সহিত পরামর্শ করি নাই। আমি যাহা নিছক সত্য বলে বিশ্বাস করি তাই বলেছি।"

(৬) "ভারত-ছাড় নীতির অভিনবত্ব বিশেষতঃ এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে অনেকের মনে আঘাত দিয়েছে। এই নীতি অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই। পাগল বলে অভিহিত হবার আশঙ্কা থাকলেও আমার বিবেক অনুযায়ী কাজ করলে আমাকে সত্য কথা বলতে হয়। এই ভারত-ছাড় নীতির পরিকল্পনা বর্তমান যুদ্ধে ও ভারতের আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আমি আমার খাঁটি দান বলে মনে করি। সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য ইহা

প্রয়োজন। তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশ সম্পূর্ণরূপে ভারত ত্যাগ না করলে সকল দলের আন্তরিক ঐক্য স্থাপিত হবে না। এই পরিকল্পনা কার্যকালে আজ পর্যন্ত যে ফাঁকিবাজি দেখছি তাহা হবে না। ব্রিটিশ শাসনের অবসানই দেশকে ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা থেকে মুক্ত করবে। ব্রিটিশকে তাড়াতে জাপানীর সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। তা'হলে ব্যাধির চেয়ে ঔষধই বেশী মারাত্মক হবে। আমাদের বৃহত্তম ব্যাধি, যে ব্যাধি আমাদের পুরুষত্ব হরণ করেছে যাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করাচ্ছে যে আমরা চিরকাল ক্রীতদাস হয়ে থাকব সেই ব্যাধি হ'তে মুক্ত হবার আন্দোলনে আমাদের সকল প্রকার ঝুঁকি :গ্রহণ করতে হবে। এই পরাধীনতার ব্যাধি আমাদেব অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি জানি ঔষধের মূল্যটা খুব বেশী। মুক্তির জন্য কোন মূল্যই অত্যন্ত বেশী নয়।"

(৭) "**গান্ধীজী চীনের বন্ধু**—ব্রিটিশকে চলে যেতে সম্মত করা এবং স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধে প্রচেষ্টায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে দেওয়াই চীনকে সাহায্য করার একমাত্র প্রকৃষ্টতম উপায়। অপ্রসন্ন অসন্তুষ্টিতে বসে না থেকে স্বাধীন ভারত মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে তখন এক দুর্দম শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে। এই সমাধান বীরত্বব্যঞ্জক ও ইংরাজের ধারণার অতীত। তথাপি আমি যাহাকে সমস্যার সম্পূর্ণ বাস্তব সমাধান বলে মনে করি ব্রিটেন, চীন ও রাশিয়ার একমাত্র বন্ধু হিসাবে তাহা প্রকাশ না করে থাকতে পারি না। বর্তমানে এই যুদ্ধ মানবতার পক্ষে এক বিঘ্নস্বরূপ। ইহাকে শুভবুদ্ধিতে পরিণত করার জন্য ঐরূপ প্রয়োজন।"

(৮) "**গান্ধীজী কি জাপ অনুরাগী ?**" এর উত্তরে তিনি বলেন, "আমার স্বাধীনতা আকাঙ্খায় যদি আন্তরিকতা থাকে তবে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞান বশতঃ আমি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করব না যাতে ভারতে কেবল প্রভুর পরিবর্তন ঘটে। সর্বান্তঃকরণে বাধা দেওয়া স্বত্বেও যদি জাপ

বিপদ ঘটে তবে ব্রিটিশের ভারতে উপস্থিতিই সেজন্য দায়ী হবে এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি এমন কোন প্রস্তাব করিনি সামরিক দিক দিয়াও যার ফলে ব্রিটিশ বা চীনা শক্তির বিন্দুমাত্র বিপদ ঘট্‌তে পারে। ভারত ছাড়লে ব্রিটেন ভারত রক্ষার দায় থেকে মুক্তি পাবে এবং প্রকৃত মানব স্বাধীনতার স্বার্থের জন্য ব্রিটেন স্বাধীন ভারতকে বন্ধুরূপে লাভ করবে। আমি ইহাই দাবি করি।"

(২) **জাপানীদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব**—গান্ধীজী ইংরাজের দুঃসময় বুঝে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ চাহেন নি। তিনি 'জাপানীদের প্রতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "আপনাদের (জাপানীদের) প্রতি আমি কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ করি না তথাপি প্রাচীন চীন দেশে আপনাদের নির্মম ধ্বংসলীলায় আমি গভীর বেদনা অনুভব করছি। আমাদের আন্দোলন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বিদ্রোহ। ইহা মারাত্মক কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ বিবাদ। ইহাতে কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আপনাদের ভারত আক্রমণ যখন আসন্ন, মিত্রশক্তিকে বিব্রত করার জন্য আমরা সেই সময় মনোনীত করেছি এরূপ গুরুতর ভুল সংবাদ আপনারা পেয়েছেন। আমাদের সেইরূপ ইচ্ছা থাকলে তিন বৎসর পূর্বে তা করতাম। ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবিই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। চীনে আপনাদের নির্মম অভিযানের সহিত ভারতের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের প্রচারিত উদ্দেশ্যের ও প্রতিশ্রুতির কোন সামঞ্জস্য নাই। আপনারা যদি জিজ্ঞাস করেন ভারতের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত সম্বর্দ্ধনা লাভ করবেন তবে আপনারা শোচনীয়ভাবে নিরাশ হবেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে পরাধীনতামুক্ত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, জার্মাণির নাৎসীবাদ বা আপনাদের মত যুদ্ধবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী

জাতিকে প্রতিহত করবার জন্য ভারতকে প্রস্তুত করা। আমরা ইহা না করলে যোদ্ধমনোভাব ও উচ্চাকাঙ্খার একমাত্র প্রতিকার অহিংসার প্রতি আমাদের আস্থা থাকা স্বত্ত্বেও বিশ্বকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলবার পক্ষে আমরা উপেক্ষনীয় দর্শকরূপে থেকে যাব। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে মিত্রশক্তি সম্মিলিত চক্র-শক্তিকে পরাজিত করতে পারবেন না।······ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে মিত্রশক্তি আপনাদের নিষ্ঠুরতা অনুকরণ না করবার নৈতিক শক্তি অর্জ্জন করতে পারেন। ব্রিটেন ভারত ত্যাগ করে গিয়েছে বলে আপনারা এদেশে প্রবেশ করবেন এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আপনাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য মিত্রশক্তিকে স্বাধীন ভারতে সৈন্য রাখবার সম্মতি দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের দেশের সর্বশক্তি নিয়োগ করে আপনাদিগকে বাধা দিতে পশ্চাৎপদ হব না।”

(১০) **মারাত্মক ঔষধ**—ইংরাজের প্রতি আমার অনুমাত্র ঘৃণার ভাব নাই।······আমি যে ‘ভারত ছাড়’ ঔষধের ব্যবস্থা দিয়েছি তাহা জনসাধারণের ঘৃণার ভাবকে প্রশমিত করবে।······আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুদ্ধের সময়ই, যুদ্ধের পর নহে, বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ সাধনে পরস্পরের মধ্যে নিষ্পত্তির প্রকৃষ্ট সময়। উহার দ্বারাই উভয়ের তথা জগতের নিরাপত্তা বিধান সম্ভবপর। উভয়ের মনো-মালিন্য বেড়েই চলেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্যই স্বার্থপ্রণোদিত ও নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হচ্ছে। উভয় পক্ষের সম্মিলিত স্বার্থ বলে কিছুই থাকতে পারে না।······ইংরাজ তাঁর চিরন্তন অভ্যাস অকস্মাৎ ত্যাগ করতে পারে না। জাতি-বৈষম্যর দাবি ছাড়া আর কিছুরই দ্বারা ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল ও আফ্রিকা দেশকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করা যায় না। এই মারাত্মক রোগের মারাত্মক ঔষধই প্রয়োজন।

'ভারত ছাড়' একমাত্র ঔষধ। ইংরাজের পক্ষে ইহাই প্রকৃত বীরের ন্যায় সর্বাপেক্ষা ত্রুটিহীন কার্য। নির্দোষভাবে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নাজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটবে।"

(১১) **যুক্তিসঙ্গত দাবি**—আমার "ভারত ছাড়" দাবির পশ্চাতে কোন কু-অভিপ্রায় নাই, কোন বিদ্বেষ নাই। আমার সকল আন্দোলনের মধ্যে এই দাবি সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। ইহা সকলের স্বার্থের জন্য কল্পিত, সম্পূর্ণ বন্ধুত্বের ভাবদ্যোতক বায, একটুও বেপরোয়া নহে। আমি খুব সতর্কতার সহিত অগ্রসর হচ্ছি। এই অগ্রগতির পশ্চাতে একটি নির্দিষ্ট দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর বললে মিথ্যা বলা হয়। সেইজন্য এই সুনিয়ন্ত্রিত অরাজকতার অবসান চাই।"

(১২) **ভারত-ছাড় নীতির অর্থ**—"ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান আবশ্যক। ভারতের সম্মতিক্রমে বন্ধুরূপে ইংরাজ থাকতে পারে। ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর চাই। যুদ্ধকালে স্বাধীন ভারতের নির্ধারিত সর্তে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী ভারতে থাকবে কারণ সৈন্য অপসরণ করলে জাপানের ভারত আক্রমণ ও চীনের পতন সুনিশ্চিত। অহিংস প্রচেষ্টায় ভারত জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকবে কিনা বা সমস্ত ভারত অহিংসার উপাসক কিনা তা আমি বলতে অক্ষম।"

(১৩) "কাহাকেও আঘাত করার মতলবে আমি এই আবেদন করি নি। সম্পূর্ণ অহিংসার মনোভাব নিয়ে এবং অহিংস পন্থারূপেই ইহা করা হয়েছে। প্রস্তাবটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত। ইংরাজ ভারত ছাড়লে হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ্ব থাকবে না, মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার পথ উন্মুক্ত হবে। ইংরাজ ভারত না ছাড়লে অহিংস শক্তি অকার্যকর হবে। এমন কি সশস্ত্র সংগ্রামও ব্যর্থ হবে।"

গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বক্তৃতা—'ভারত ছাড়' প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে বহু আলোচনা হয়। গান্ধীজী ১৪ই জুলাই (১৯৪২) ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্ধার অধিবেশনে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার সারমর্ম এইরূপ:—

"এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি আপনাদের অধিনায়ক হিসাবে নহে, আপনাদের নিয়ন্তা হিসাবে নহে; আপনাদের সকলের অধম ভৃত্য হিসাবেই আমি আপনাদের নায়কত্ব গ্রহণ করছি। জাতির যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেবকরূপে পরিগণিত হবেন তিনিই তাঁদের প্রধান হবেন। আমি নিজেকে জাতির প্রধান সেবক মনে করি বলে আপনাদিগকে যে সকল আঘাত মাথা পেতে নিতে হবে আমি তার অংশ গ্রহণ করতে চাই।

"আমি গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকের বন্ধুত্ব হতে বঞ্চিত হয়েছি। আমার বুদ্ধি-বিবেচনায় এমন কি সততায় সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। পশ্চিমের বন্ধুগণের আস্থা যতই আমি হারাই না কেন আমি আমার অন্তর দেবতার আহ্বান কোন কারণেই উপেক্ষা করতে পারব না। একে বিবেকই বলুন আর যাই বলুন—আমি মনস্তত্ব জানি না আপনাদিগকে ইহা বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে এই আহ্বানের সঙ্গে আবার পরিচয় আছে। আমার অন্তরের ঐ বাণী আমাকে বলছে 'তোমাকে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত তুমি সাহসের সঙ্গে সমগ্র জগতের হতে পারবে ততদিন তুমি নিরাপদ। জগতের রক্তচক্ষু দেখে ভীত হও না, এগিয়ে যাও, কেবলমাত্র ভগবানকে ভয় করিও।' ভগবান আমার অন্তরে বিরাজমান। আপনাদিগকে পত্নী, বন্ধু-বান্ধব, জগতের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে হবে। আমি যতদিন পারি বাঁচতে চাই, কিন্তু বেশীদিন বাঁচব বলে আমার মনে হয় না। আমার জীবনের অবসান হ'লে ভারত স্বাধীন হবে, শুধু ভারত নহে সমগ্র জগত স্বাধীন হবে।

"আমার মনে হয় না ইংরাজ বা মার্কিণ জাতি স্বাধীন। তাঁদের মতেই তাঁরা স্বাধীন......কংগ্রেসের কার্যক্রম প্রথম থেকেই অহিংস পথে চলছে। আমি জানি কংগ্রেসে বহু ছদ্মবেশী অহিংসপন্থী আছেন কিন্তু আমি সাধারণতঃ তাঁদের কোন পরীক্ষা না করেই বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসই আমার জীবনের মূলমন্ত্র।

"আমি ইংরাজ ও সম্মিলিত জাতির প্রত্যেককে স্ব স্ব অন্তর পরীক্ষা করে দেখতে বলি। আজ কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবি করে কী এমন অপরাধ করেছে? এই দাবি কী দোষের? কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করা কী যুক্তিসঙ্গত? আমি আশা করি কোন ইংরাজ এরূপ মনে করবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কিংবা মার্শাল চিয়াংকাইশেক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এইরূপ অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করেন বলে মনে হয় না।

"সম্মিলিত জাতিসমূহ এমন কি ভারতও যদি বলে আমি ভ্রান্ত তথাপি আমি এগিয়ে চলব, শুধু ভারতের জন্য নহে, সমগ্র বিশ্বের জন্য। ব্রিটেন ভারতকে নিন্দা করছে। কিন্তু আমরা আর এক স্তর নেমে যাব না, আমাদিগকে ভদ্রভাবেই অগ্রসর হতে হবে। আমাদের বর্তমান দাবির সঙ্গে পূর্ব দাবির কোন অসঙ্গতি নাই।

"সম্মিলিত জাতি সমূহ এখন ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করবার ও তাঁদের প্রকৃত মনোভাব জানাবার সুদীর্ঘ সুযোগ পেলেন। এই সুযোগ যদি তাঁরা নষ্ট করেন তবে ইতিহাস বলবে যে ভারতের প্রতি তাঁদের যে ঋণ তাহা তাঁরা পরিশোধ করেননি। এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য আজ সমগ্র জগতের আশীর্ব্বাদ ও সম্মিলিত জাতি সমূহের সহায়তা আমি কামনা করি। আমি কংগ্রেসকে কথা দিয়েছি কংগ্রেস সাফল্য লাভ করবে, না হয় মৃত্যুবরণ করবে। কর না হয় মর, (করেঙ্গে ঔয়া মরেঙ্গে)।

"এমন একদিন ছিল যেদিন প্রত্যেক মুসলমান ভারতবর্ষকে তার নিজ মাতৃভূমি বলে দাবি করত। এটা যে মিথ্যা বা ধোঁকা এ-কথা আমি এক মুহূর্তের জন্য ত বিশ্বাস করব না। সহকর্মিদের সন্দেহ করা অপেক্ষা বরং তাঁদের বিষয় কিছু না জানাই আমি ভাল মনে করি। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান আমাকে বলেছে যে কংগ্রেস যদি সত্যই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে চিরস্থায়ী ভাবে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিধান করতে চায় তাহলে আমার জীবিতকালের মধ্যে তা সম্ভব হতে পারে। শৈশব হতেই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক মিলনে আমি বিশেষ আস্থাবান। যখন স্কুলে ছাত্র হিসাবে পড়াশোনা করতাম তখন হতেই ভারতের ঐক্যে আমি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে আসছি। যখন আফ্রিকায় ছিলাম তখন মুসলমানদের উকিল হয়ে আমি ঐ বিশ্বাস অবলম্বন করি। আমি তাঁদের প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করি, কখনই আমি তাঁদের সন্দেহ করতাম না। ব্যর্থ-মনোরথ বা পরাজিত হয়ে আমি আফ্রিকা হতে ফিরে আসি নি। আমার কতিপয় মুসলমান বন্ধু আমার উপর দোষারোপ করেছেন কিন্তু আমি তাতে বিচলিত হই নি। তাঁদের ক্ষুব্ধ করে এমন কি করেছি তা আমি কিছুতে বুঝে উঠতে পারলাম না। নিঃসন্দেহে আমি গাভীর উপাসক কিন্তু জগতে প্রত্যেক প্রাণীই ভগবানের সৃষ্ট ইহা আমার বিশ্বাস। আমার বন্ধুরা বিশেষতঃ আমার মুসলমান বন্ধুগণ মৌলানা বারী ও মৌলানা আজাদ এর সাক্ষ্য দেবেন। আমি মুসলমানদের সঙ্গে ভোজন করি। ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে আমি সকলের সঙ্গে একত্রে ভোজন করে থাকি।

"আমি কাহাকেও ঘৃণা করি না। আমার অন্তরে ঘৃণার স্থান নাই; আমি লক্ষ্নৌ-এ মৌলানা বারীর আতিথ্য স্বীকার করি। তখন পারস্পারিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছিল না। মিঃ জিন্নাও অতীতে একজন কংগ্রেসকর্মীই ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভ্রান্ত দল দ্বারা চালিত বলেই মনে হয়। আমি

তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং প্রার্থনা করি তিনি আমার জীবনাবসানের পরও বেঁচে থাকুন। এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন তিনি বুঝতে পারবেন যে আমি তাঁর বা মুসলমানদের প্রতি কোন অন্যায় করিনি, মুসলমানদের আন্তরিকতার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। যদি তাঁরা আমাকে হত্যাও করেন তথাপি আমি তাঁদের নিন্দা করব না। আমার বিষয় যে কোন রকমের ধারণা করার অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে, তবে আমি পুরাণো দিনের ঠিক সেই ব্যক্তিই আছি। উত্তেজনার মুহূর্তে মুসলমানগণ আত্মবিস্মৃত হয়ে আমাকে গালাগালি দিতে পারেন কিন্তু ইসলাম গালাগালি দেওয়ার শিক্ষাদান করে না। ভারতের মুসলমানরা তাঁদের ধর্মগুরুর প্রকৃতভাবে অনুসরণ করুন। যদি তাঁদের নিন্দাবাদ আমার নিকট বুলেট অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর তথাপি আমি সেগুলি বরণ করে নিচ্ছি।

"ঈশ্বর আমাকে যে আদর্শ প্রচারে আদেশ করছেন তার জন্যই আমি আমার সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োজিত করছি, তার জন্য আমি মৃত্যুবরণেও প্রস্তুত। হিন্দু-মুসলমানের মিলন আমার জীবনের প্রিয়দর্শন। পাকিস্থান সম্পর্কে আমার মনে দ্বিধার ভাব নাই; পাকিস্থান হিন্দুস্থান হইতে পৃথক হতে পারে না, কিন্তু আমাদের সকলকেই আজ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। মিঃ জিন্না কংগ্রেসের কার্যপন্থা ও দাবিতে বিশ্বাস করেন না বলেই আমার মনে হয় কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি মিঃ জিন্না যতদিন আকৃষ্ট না হন ততদিন আমি অপেক্ষা করতে পারি না। আমি অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছি। সাম্প্রদায়িক ঐক্য দেশের স্বাধীনতার পক্ষে অপরিহার্য্য তবে সে স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতা হওয়া চাই। কোন সম্প্রদায় বিশেষের স্বাধীনতা নয়। মৌলানা

সাহেব যে ব্রিটিশকে বলেছিলেন তোমরা ভারতবর্ষকে যে কোন সম্প্রদায়ের হাতে ছেড়ে দাও—আমি তাঁর এই দাবি পূর্ণভাবে সমর্থন করি। মুসলমান জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেও আমি তাতে একটুও দুঃখিত হব না। ভারতবর্ষ ভারতীয় মুসলমানদের জন্মভুমি।"

গান্ধীজীর নির্দেশ—"ভারত ছাড় আন্দোলনে আমি সকলকে চিন্তায় না হয় অন্ততঃ কার্য্যে অহিংস হতে অনুরোধ করি। যদি একটুও সাম্প্রদায়িক কলুষ মনে থাকে তবে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন হতে দূরে থাকবেন। মনে স্থান দেবেন না যে ব্রিটিশরা যুদ্ধে হারবে। ব্রিটিশরা কাপুরুষের জাত নহে, ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা দূর করতে হবে। অন্ততঃ আমার মনে এরূপ ঘৃণা নাই। বাস্তবিক আমি এখনকার মত ব্রিটিশের অধিক শুভাকাঙ্খী আর কখনও হয়নি। আমার বন্ধুত্ব দাবি করে যে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় আমি তাঁদের ভুল দেখিয়ে দেব। জাপানীদের অভ্যর্থনা করবার মনোভাব ত্যাগ করুন। অহিংসা আমার জীবনের ধর্ম। কিন্তু দেশবাসী ইহাকে কার্যপন্থা হিসাবে গ্রহণ করুন। নিয়মানুবর্তি সৈন্য হিসাবে আপনারা অহিংসকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করুন এবং আন্দোলনে ইহাকে আঁকড়াইয়া থাকুন। কংগ্রেস আসুক বা না আসুক আমি আন্দোলন সুরু করব।" ১৪ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' খসড়া প্রস্তাব সামান্য পরিবর্তিত করে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

কংগ্রেস-প্রস্তাবের সমালোচনা—ব্রিটিশ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা হয়। তাঁদের যুক্তি এইরূপ:— গান্ধীজী ব্রিটিশের বিপদ বুঝে সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব করেছেন যাহাতে জাপানী আক্রমণের সুবিধা হয়, গণ আন্দোলনে দেশে অরাজকতা ও সামরিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সমর-প্রচেষ্টা ব্যাহত

হয়। সমালোচকরা গভর্ণমেণ্টকে দমন নীতি অবলম্বনে প্ররোচিত করেন। বিরুদ্ধবাদিরা গান্ধীজীর সততায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। অনেকে গান্ধীজীকে বিপজ্জনক কল্পলোকবিহারি বা বাস্তব ভাবে কাজ করতে অপারক বলে নিন্দা করেন। আমেরি হুমকি দেখায়, "ভারত ছাড়লে গভর্ণমেণ্টের বৃহৎ ও জটিল শাসন যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ও আকস্মিক ভাবে বিকল হবে। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য যাহা কিছু করা কর্তব্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তা থেকে বিবত হবে না"। ইহাতে বুঝা যায় ভারত গভর্ণমেণ্ট বহু পূর্ব থেকে অমানুষিক দমননীতি অবলম্বনেব জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মুসলীম লীগ, জাতীয়তাবাদী দল, হিন্দু মহাসভা, অনুন্নত সম্প্রদায়, কমিউনিষ্ট দল 'ভারত ছাড়' নীতির সমালোচনা করেন।

গান্ধীজীর শেষ আবেদন—সমালোচকদের উত্তরে তিনি বলেন, "ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ জাতির একনিষ্ঠ সেবক, দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ সজাক। আমি হিটলারের মত ডিক্টেটর নহি। আমি আট দিন যাবৎ যুক্তি দিয়ে বন্ধুদের স্বমতে আনি। আমি আদেশ দিই না। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে, প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহা Axis সমর্থক নহে, বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানও নহে।...কংগ্রেসের দাবি এত সুস্পষ্ট যে ইহা নির্বোধের বোধগম্য। ব্রিটিশরা যে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে কংগ্রেস সেই স্বাধীনতা চেয়েছে? ইহাতে আপত্তি কী? যে স্বাধীনতা ব্রিটিশ যুদ্ধের পরে দিতে চেয়েছে যুদ্ধ জয়ের কয়েক দিন পূর্বে দিতে এত আপত্তি কেন? ইহাতে ব্রিটিশের আন্তরিকতায় সন্দেহ জন্মে।" "আমি সত্যকে ভগবান বলে জানি। সত্য সাক্ষী করে বলছি ব্রিটেন ও মিত্র শক্তির স্বার্থের জন্য ভারতকে স্বাধীন করার দরকার যদি না বুঝতাম তবে আমি 'ভারত ছাড়' নীতির প্রবর্তন করতাম না। আমাদের ইচ্ছা সিঙ্গাপুর ও মালয়ের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি

যেন ভারতে না হয়। ভারতবাসীর সদিচ্ছা মিত্রশক্তির সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানপোতের মতই মূল্যবান হবে।···মিত্রশক্তির সমবেত ক্রোধ ও বিরক্তির ঐক্যতান কংগ্রেসকে বিচলিত করবে না। এই হিষ্টিরিয়া সুলভ আক্ষেপ-চীৎকার বিদ্রোহের আলোক নিভাতে পারবে না। 'ভারত ছাড়' দাবির ন্যায্যতা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করে না। দাবি উত্থাপনের সময়টা নিয়ে যত আক্রমণ। এই সময়-নির্বাচনের কারণ এই যুদ্ধে পরাধীন ভারতবর্ষ সক্রিয়ভাবে কোন অংশ গ্রহণ করে নাই। স্বাধীন ভারত এই যুদ্ধে গৌববময় ভূমিকা গ্রহণ করবে। শেষ সমাধানে ভারতের হাত থাকবে। জাপানীরা এখন ভাবতে পদার্পণ করিলে ভারতবাসীর গোপন অসন্তোষ জাপানীদের অভ্যর্থনায় আত্মপ্রকাশ কববে। ইহা অপেক্ষা ভীষণতর সর্বনাশ আর কিছু হবে না।···এই সহজ স্বাভাবিক সাধু প্রস্তাবকে উপেক্ষা করার অর্থ সর্বনাশকে বরণ করা। কংগ্রেস নিজের জন্য ক্ষমতা চায় না, চায় স্বাধীনতা।"

কংগ্রেসের ঐতিসাসিক আগষ্ট প্রস্তাব—সারমর্ম :—"ভারতের জন্য ও মিত্র শক্তির সাফল্যর জন্য ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়া দরকার। ···স্বাধীনতা দান অপেক্ষা পরাধীন দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন ও ধনতান্ত্রিক প্রথাকে বজায় রাখার চেষ্টার উপর মিত্র শক্তির শাসন নীতি প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি বারংবার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। ···ভারতের স্বাধীনতার দ্বারা ব্রিটেনকে বিচার করা হবে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানই প্রধান ও আশু সমস্যা এবং ইহার উপর যুদ্ধেব সাফল্য নির্ভর করছে। স্বাধীন ভারত সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করে সশস্ত্র উপায়ে ও অহিংস শক্তির সাহায্যে এই সাফল্য সুনিশ্চিত করবে। স্বাধীন ভারতে প্রতিনিধিমূলক সর্বদলীয় অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে। এই গভর্ণমেণ্টের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

ন্যস্ত থাকবে। এই গভর্ণমেণ্ট গণ-পরিষদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন। ...ভারতের স্বাধীনতা বিদেশীর কবল থেকে এশিয়ার অন্যান্য জাতির মুক্তির প্রারম্ভিক ব্যবস্থা। বিশ্বের শান্তির জন্য স্বাধীন জাতিসমূহ নিয়ে বিশ্ব রাষ্ট্র সংগঠন করা প্রয়োজন।"

"...শেষ আবেদন ব্যর্থ হলে অহিংস পন্থায় ব্যাপকতম গণ আন্দোলন স্থরু হবে। গত বাইশ বৎসরে দেশ যে অহিংস শক্তি অর্জন করেছে সে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব করবেন গান্ধীজী। সহনশীলতা ও সাহসের সঙ্গে আন্দোলনের দুঃখকষ্ট বরণের জন্য কমিটি জনগণকে অনুরোধ করছে। সকলে মনে রাখবে অহিংসা এই আন্দোলনের মূলভিত্তি, এমন সময় আসতে পারে যখন আর নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হবে না এবং নির্দেশও জনগণের নিকট পৌছবে না। তখন হয়ত কোন কংগ্রেস কমিটিও আর কাজ চালাতে পারবে না। তখন জনগণকে সাধারণ নির্দেশের উপর কর্তব্য স্থির করতে হবে। গণ-আন্দোলন দ্বারা কংগ্রেসের ক্ষমতা হাত করবার কোন উদ্দেশ্য নাই।"

গান্ধীজীর শেষ নির্দেশ—গান্ধীজী সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ করেন। সরকারি কর্মচারিগণকে গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে বলেন যে তাঁরা কংগ্রেসের পক্ষে আছেন। দেশীয় রাজাদের প্রজাদের শাসন ক্ষমতার অংশ দিয়ে প্রজাদের সদিচ্ছা অর্জন করতে উপদেশ দেন। তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে প্রজাদের অছিস্বরূপ হতে বলেন।

গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবঃ—গান্ধীজী প্রকৃত আন্দোলন আরম্ভ করবার পূর্বে বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে আপোষ-মীমাংসার শেষ চেষ্টা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ক্রীপস চলে যাবার পর থেকে চার মাস বড়লাট মীমাংসার কোন চেষ্টা করেন নাই যদিও মিত্রশক্তির অনেক নেতা এই বিষয়ে খুব চাপ দেন। আবার গান্ধীজী যদি মীমাংসার চেষ্টা করেন তবে মিত্রশক্তির

জনমত বড়লাটের বিরুদ্ধে যাবে এই ভয়ে তাঁকে মীমাংসার কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। ৮ই আগষ্ট রাত্র দশটায় A. I. C-C. অধিবেশন শেষ হয় এবং গভর্ণমেণ্ট সেই রাত্রেই নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে :—গভর্ণমেণ্ট 'ভারত ছাড়' দাবি দেশবাসীর ও মিত্রপক্ষের প্রতি গভর্ণমেণ্টের যে দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা আছে তার পক্ষে সামঞ্জস্যহীন মনে করে। ব্রিটিশ শক্তি অপসারিত হলে ভারতে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে, অর্থনৈতিক জীবন বিপদগ্রস্থ হবে। কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে না, দেশের অন্য দল এর প্রতিবাদ করছে। এই দু'এক দিনের মধ্যে সাময়িক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যাতে আন্দোলন বিস্তৃত না হতে পারে গোড়া হতে তার প্রতিবিধান করা দরকার।"

গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার ঃ—৯ই আগষ্ট ভোর বেলায় গান্ধীজীকেও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করে পুণায় আগা খাঁ প্রাসাদে অন্তরীণ রাখা হয়। এই সঙ্গে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়, ভারতে সর্বত্র বহু নির্দোষী কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। বহু অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। তখন কোথাও কোন আন্দোলন সুরু হয়নি। তারপর জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ ভাবে শোভাযাত্রা পরিচালনা করে এবং সভার অনুষ্ঠান কোরে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের 'সিংহবিক্রমে অনুষ্ঠিত অমানুষিক ও অপ্রয়োজনীয় অত্যাচারে উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত হয়ে জনগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠে। গভর্ণমেণ্টের এই দমননীতিএত ব্যাপক আকারে দেখা দেয় যে দাঁতের বদলে দাঁত এই নীতিকে ছাড়িয়ে একটা দাঁতের বদলে দশ হাজার দাঁত উপড়ানর মত হয়।' (গান্ধীজীর কথা)। পুলিশ ও মিলিটারি নির্দোষ শোভাযাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ দ্বারা ছত্রভঙ্গ করে, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বহু লোককে

হতাহত করে, বিপ্লবীদের ঘরে আগুণ লাগিয়ে দেয়, লোকের বাসভূমি লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে, বহু নারীর এমন কি গর্ভবতী ও রুগ্নানারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে, শিশুদের নির্মমভাবে প্রহার করে, পুরুষদিগকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করে, পুংলিঙ্গের উপর সোরা ও চূণের প্রলেপ দেয়, নখের গোড়ায় কাঁটা ফুটিয়ে দেয়, বেপরোয়াভাবে নিরীহ গ্রামবাসিদের গৃহাদি লুণ্ঠন করে। অনাহারে হাজতে আটক রাখা, বিনাবিচারে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ রাখা, পাইকারী জরিমানা আদায় করা, গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় এক লক্ষ লোক গ্রেপ্তার হয়, কুড়ি হাজার বন্দী হয়, এক হাজার নিহত ও ছয় হাজার লোক আহত হয়। ভারত-রক্ষা আইনের অজুহাতে বিদেশী শাসকবর্গের নিষ্ঠুর ক্রিয়া-কলাপের কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়।

বিয়াল্লিশের বহ্নি—দেশের লোক এই সকল অত্যাচারে ধৈর্যের সীমা হারায়। তারা তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অহিংস পথ ছেড়ে হিংসার পথ অবলম্বন করে। ইহাতে কংগ্রেসের কোন নির্দেশ ছিল না। তারা বহুস্থানে রেলপথ ধ্বংস করে, টেলিগ্রাফ টেলিফোন তার কেটে যোগাযোগের সূত্র বিচ্ছিন্ন করে, বহু পোষ্টাফিস, থানা, আদালত, সরকারি অফিস্, আবকারি দোকান, ষ্টেশন লুণ্ঠন ও দগ্ধ করে, ট্রাম ও মোটরট্রাক পোড়াইয়া দেয়, সামরিক রাস্তা ক্ষতি সাধন কোরে অচল করে দেয়। ছাত্র-ছাত্রী, চাষী-মজুর দলে দলে 'ইংরাজ ভারত ছাড়' 'কর না হয় মর' এই ধ্বনি কোরে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। আইন অমান্য করে শোভাযাত্রা সভা-সমিতি হতে থাকে। মেদিনীপুর, বালিয়া ও সাতারায় দুই বৎসর যাবৎ জাতীয় সরকার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মত শাসন কার্য পরিচালনা করে। কয়েক স্থানে

কনষ্টেবল, পুলিশ অফিসার ও হাকিম নিহত হয়। কয়েকজনকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে আটক রাখা হয়। অনেকে গুপ্তভাবে (Underground) আন্দোলন চালাতে থাকেন। গুপ্তভাবে radio যোগে আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এই বিপ্লবই **আগষ্ট বিপ্লব নামে** বিখ্যাত। ইহাই গান্ধীজীর (?) শেষ গণ-আন্দোলন এবং ভারতের শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধ। (প্রায় এই সময়ে নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ সৈন্য বাহিনী গঠন কোরে ইম্ফল পর্যন্ত অগ্রসর হন)।

অগষ্ট বিপ্লবের বৈশিষ্ট—আগষ্ট বিপ্লবের পরিচালনার জন্য কোন বড় নেতা ছিলেন না, তখন নেতাদের প্রায় সকলেই কারাগারে। কোন পরিকল্পনা ছিল না, পরস্পরের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না, কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। এই বিপ্লবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, কৃষক-শ্রমিক যোগ দেয়। আগষ্ট বিপ্লবের সময় কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয় নাই। আগষ্ট বিপ্লব ছাত্র-আন্দোলন বা কংগ্রেস-আন্দোলন ছিল না। দুই শত বৎসর ব্যাপী ইংরাজের কুশাসন ও শোষণের ফলে ভারতবাসীর মানবীয় ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হয় এবং সর্বত্র অসন্তোষের ভাব দেখা যায়। ইহারই বিষময় ফল আগষ্ট বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা একটি অত্যাচারিত জাতির স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন। ইহাতে কংগ্রেসের বিশেষ নেতৃত্ব বা নির্দেশ ছিল না।

বড়লাটের অভিযোগ ও তার উত্তর—গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের ঘাড়ে এই সব হিংসাত্মক কার্যের দোষ চাপিয়ে একটি সারকুলার (Tottenhams' Circular) জারি করেন। এই বিষয় লইয়া গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে কয়েকখানি পত্র বিনিময় হয়। বড়লাট অভিযোগ করেন:—"কংগ্রেস পূর্ব হইতে হিংসাত্মক কার্য্যাবলীর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। মিঃ গান্ধী ১৪ই জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে এই প্রস্তাব

প্রত্যাহার করার বা আপোষ-মীমাংসার কোন অবকাশ নাই। এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ যথাসম্ভব ক্ষণস্থায়ী ও দ্রুত করব। কংগ্রেস গোপনে হিংসাত্মক কার্য্যাবলীর উপদেশ জারি করে। সর্বত্র একই প্রকার হিংসাত্মক কার্য্যাবলীর প্রয়োগের অর্থ এক জায়গা হতে একই উপদেশ গিয়েছে। বহুস্থানে কংগ্রেস নেতারা ও কর্মীরা বক্তৃতা দিয়েছে ও হিংসাত্মক কার্য করেছে।" গান্ধীজী এই সকল অভিযোগের প্রত্যুত্তর দেন। তিনি সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকে গভর্ণমেণ্টের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করেন। হিন্দু মহাসভা, জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল উদার নৈতিক দল গভর্ণমেণ্টের মত বদলাবার ও নেতাদিগকে মুক্তি দিয়ে অচল অবস্থা অবসানের জন্য অনেক আন্দোলন করেন; সবই নিষ্ফল হয়। গান্ধীজী ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বড়লাটকে পত্র দিয়ে তাঁর ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সাক্ষ্য ও দলিল দিয়ে কোন নিরপেক্ষ Tribunal দ্বারা প্রমাণ করতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজীর মতে গভর্ণমেণ্টের নির্য্যাতনই (leonine violenc) বিপ্লবের জন্য দায়ী। তার উপরে দেশব্যাপী জিনিষ-পত্রের দুর্মূল্যতা ও দুস্প্রাপ্যতার দরুণ দরিদ্রলোকের যে অর্থকষ্ট হচ্ছিল তা পরিষদের নিকট দায়ী প্রকৃত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে অনেকাংশে লাঘব হত। তিনি শেষকালে বলেন—"যদি বড়লাট তাহার অভিযোগগুলি প্রমাণ না করেন তবে আমি ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২১ দিন সত্যাগ্রহীর সামর্থ্য অনুযায়ী অনশন (Satyagrahi's Capacity Fast) করব। ইহা আমরণ অনশন নহে। অনশনে কেবল লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করব।"

বড়লাটের নিকট ন্যায়বিচার না পেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের নিকট ন্যায় বিচার পাবার জন্য অনশন করবেন পত্রে জানান।

বড়লাট উত্তরে বলেন,"অভিযোগগুলি প্রমাণের উপযুক্ত সময় আসেনি।

শীঘ্রই আপনাকে প্রমাণিত অভিযোগের জবাবদিহি করতে হবে। আপনার এই অস্বস্থিকর অবস্থা থেকে মুক্তির পাওয়ার জন্য আপনি অনশন করছেন। ইহা এক প্রকার রাজনৈতিকভীতি-প্রদর্শন (Political Blackmail)" গান্ধীজী তাঁর সম্বন্ধে বড়লাটের এই নীচ ধারণায় খুব ব্যাথিত হ'ন।

গান্ধীজীর ঐতিহাসিক অনশন—যাহা হউক গান্ধীজী কারাগারে (পুণার আগা খাঁর প্রাসাদে) ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী দ্বি-প্রহরে তাঁর বিখ্যাত অনশন আরম্ভ করেন এবং ৩রা মার্চ বেলা ৯-৩৪ মিনিটে "জানি না ভগবান কেন আমাকে বাঁচালেন, বোধ হয় আমার দ্বারা আরও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন" এই বলে অনশন ভঙ্গ করেন। এই অনশনে তিনি মৃত্যুর দ্বার হতে ফিরে আসেন। এই অনশন সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিধান রায় একটি মর্মস্পর্শী বিবৃত দেন, "অলৌকিক ঘটনা ঘটল। গান্ধীজী তাঁর বয়স (৭৪), ডাক্তারের ভয়, দৈহিক সাম্যতা উপেক্ষা করে এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। অনশনটা একজন পরম ভক্তের তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ছিল। সমস্ত ব্যাপারটি একটা ধর্মানুষ্ঠান। এই অনশনে তাঁর মৃত্যুবরণ করবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। তাঁর মতে একুশ দিন অনশনই তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃষ্ট সময়। শরীর হতে দূষিত পদার্থ অপসারিত করবার জন্য তিনি জলের সঙ্গে সামান্য লেবুর রস পান করেন। তিনি প্রার্থনার সঙ্গে অনশন আরম্ভ করেন এবং প্রার্থনার সঙ্গে তা ভঙ্গ করেন। সারা অনশনের মধ্যে তিনি অনন্ত শক্তির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। দিনের পর দিন যখন ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণী-গণ তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি সর্বশক্তিমান ভগবানের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেন। গান্ধীজী কি প্রকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাফল্যর সহিত অনশনের পরিসমাপ্তির প্রতীক্ষা করেন, কি প্রকারে গান্ধীজী মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন—এই দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করা পরম সৌভাগ্য

বলে মনে করি। ইহা প্রাচীন কালে অনুষ্ঠিত পরম ভক্তের যজ্ঞের মত। অনশন পরিসমাপ্তির সময় তিনি কপাটে ঠেস দিয়া চক্ষু বুজলেন। আমি জোর করে বলতে পারি ভগবানকে নিজের অন্তরের কাছে অনুভব করবার জন্য তিনি এইরূপ করলেন। অনশনের ৮ম দিনে বিকালে তাঁর অবস্থা এত শোচনীয় হয় যে প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁর মৃত্যুর জন্য আমরা শঙ্কিত হয়েছিলাম কিন্তু কি শক্তির সাহায্যে তিনি রক্ষা পেলেন আমাদের কেহই তা বুঝতে পারি নি। মনে হয় তাঁর শরীরের উপর মনের পূর্ণ ক্ষমতা এবং তাঁর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার অদম্য ইচ্ছাই তাঁকে বাঁচাল। তিনি নিজের দেহের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপকে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছিলেন।"

গবর্ণমেণ্টের জিদ—আগষ্ট প্রস্তাবের পর হতে গভর্ণমেণ্টের নীতি হল সমস্ত নেতাদের কারাগারে আবদ্ধ রাখা। কাহাকেও এমন কি Mr. Philips ও ভারতবর্ষের Metropolitanকে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় নি। বিলাত ও আমেরিকার সংবাদপত্রের, বিলাতের অনেক নেতার, ভারতের অনেক অ-কংগ্রেসী নেতার ও সর্বদলীয় কনফারেন্সের প্রস্তাবের দমননীতি বন্ধ করার ও আপোষ-মীমাংসা করার অনুরোধ বড়লাট উপেক্ষা করলেন। সকল দল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী করল। প্রধান মন্ত্রী চার্চিল এই সকলের উত্তরে বলেন, "কংগ্রেস সর্বভারতের প্রতিনিধি নয়, কংগ্রেসের বাহিরে নয় কোটি মুসলমান, ৫ কোটি অস্পৃশ্য, ৯½ কোটি দেশীয় রাজ্যের প্রজা আছে। ইহা একটি দলগত প্রতিষ্ঠান, শিল্পপতি ও ধনী লোক দ্বারা পুষ্ট। আমরা যুদ্ধে আমাদের অধিকার বজায় রাখব। আমরা সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখব। আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করার জন্য প্রধান মন্ত্রী হই নি।" অনশনের সময় গান্ধীজীর বিনাসর্তে মুক্তির জন্য দেশ ও বিদেশে তুমুল আন্দোলন হয়। দেশের ও বিদেশের বহু নেতা

ও প্রতিষ্ঠান মুক্তির জন্য আবেদন করে। পাষাণহৃদয় বড়লাট কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না। গভর্ণমেণ্টের নীতির প্রতিবাদে স্যার হোমি মোদী, শ্রীনলিনী সরকার ও মিঃ এম, এস. এ্যানে বড়লাটের শাসন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি থাকায় বিহারের লাট স্যার টমাস ষ্টুয়ার্টকে, পাঞ্জাবের মিঃ মুনকে (I. C. S) পদত্যাগ করতে বাধ্য করান হয়, আলা বক্স প্রধান মন্ত্রীত্ব হতে অপসারিত হন। এপ্রিলে (১৯৪৩) Federal court সিদ্ধান্ত করলেন, Defence of India Act এর Rule 26 আইনতঃ অসিদ্ধ এবং এই আইনে গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার ও আটক রাখা বে-আইনী। বড়লাট তাঁহাদিগকে ছেড়ে না দিয়ে এই বে-আইনী কাজকে আইনতঃ সিদ্ধ করার জন্য আবার নূতন এক অর্ডিন্যান্স জারি করলেন।

মুক্তি—আগা খাঁর প্রাসাদ-কারায় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই ও ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী কস্তুরীবাই গান্ধী পরলোকগমন করেন। মালব্যজীর আবেদনে ৫ই মার্চ সারা ভারতে কস্তুরীবাই দিবস পালিত হয়। গান্ধীজী প্রবর্তিত কস্তুরীবাই Trust Fundএর জন্য এক কোটি দশ লক্ষ টাকা চাঁদা ওঠে। এই অর্থ দিয়ে ভারতের অনেক স্থানে গঠনমূলক কার্যের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন ওয়াভেল বড়লাট পদে নিযুক্ত হন। এই নূতন নিয়োগ দ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বিনাসর্তে তাঁকে মুক্তি দেন। ১১ই মে স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি জুহুতে যান এবং বিশ্রামের জন্য ১৪ই মে হইতে এক পক্ষ কাল মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ১৫ই মে তিনি ডাঃ দীনশাহ মেহতার স্বাভাবিক চিকিৎসাগারে (Nature clinic) চিকিৎসার জন্য পুনায় যান।

গান্ধী-জিন্না প্রথম আলোচনা—গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য বারংবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা তাঁর জীবনে অমর কীর্তি। যখনই ভারতবাসী শাসন-সংস্কারের দাবী জানিয়েছে তখনই ব্রিটিশ সর্ত দিয়েছে— কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দল একত্র মিলে যে শাসনতন্ত্র চাইবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তা দেবে কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টই এই হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টাকে চিরকাল বাধা দিয়েছে উপরন্তু তারাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে সৃষ্টি করেছে, নানা উপায়ে (যথা পৃথক নির্বাচন প্রথা, আসন সংরক্ষণ, Communal Award দ্বারা) একে পুষ্ট করেছে এবং এতে নানা প্রকারে উস্কানি দিয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধই ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্তম্ভ। 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে মুসলীম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে মিঃ জিন্না সভাপতির আসন হতে বলেন, "পাকিস্থানের ভিত্তিতে মিঃ গান্ধী যদি লীগের সঙ্গে আপোষ করতে প্রকৃতই ইচ্ছুক হন তবে আমার চেয়ে আর কেহ এই প্রস্তাবকে অভ্যর্থনা করবে না। হিন্দু-মুসলমানের উভয়ের পক্ষে এটা খুব আনন্দের দিন হবে। যদি মিঃ গান্ধী ইহাই মনস্থ করে থাকেন তবে আমাকে সরাসরি পত্রে জানাতে বাধা কী? তাঁকে বাধা দেবার কে আছে? আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করি না যে যদি মিঃ গান্ধী আমাকে এইরূপ পত্র লেখেন তবে ভারত সরকার তা বন্ধ করতে সাহস করবে।" এই বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে কারাগার হতে ১৯৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ কববার জন্য একখান পত্র পাঠান কিন্তু ভারত সরকার গান্ধীজীকে কোন রাজনৈতিক পত্র পাঠাবার কিংবা মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন। ভারত সরকার গান্ধীজীকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের সুযোগ না দেওয়ায় দেশব্যাপী নিন্দা ও অসন্তোষ প্রকাশ পায়। মিঃ জিন্নাও

গান্ধীজীর পত্র না দেখেই অন্য বিবৃতি দেন। তাতে তিনি বলেন, "যদি মিঃ গান্ধী ৮ই আগষ্টের ভারত-ছাড় প্রস্তাব ও নীতি পরিত্যাগ করেন এবং পাকিস্থানের ভিত্তিতে আপোষ করেন তবে আমি রাজি আছি।" লিন্‌লিথ্‌গো ও ওয়াভেল হিন্দু মুসলমানের ঐক্য স্থাপনে বরাবরই বাধা সৃষ্টি করেছেন।

গান্ধীজী বন্ধন-মুক্তির পরই ৭ই জুলাই পাঁচগণি থেকে মিঃ জিন্নাকে পত্র দেন, "ভাই জিন্না, একদিন ছিল যখন আমি মাতৃভাষায় কথা বলতে আপনাকে প্ররোচিত করেছি। আজ সেই ভাষাতেই লিখতে সাহস করছি। কারাগারে থাকতে আমার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করে-ছিলাম কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সে পত্র আপনার নিকট পাঠায় নি। মুক্তি পেয়ে আর পত্র দিই নি। কিন্তু আজ মন ডেকে বলছে আপনাকে পত্র দিতে। আপনার ইচ্ছামত দিনে আসুন, মীমাংসার চেষ্টা করি। আমাকে ইসলামের বা এ দেশের মুসলমানদের শত্রু মনে করবেন না। শুধু আপনার নয়, সারা দুনিয়ার আমি বন্ধু ও দাস, আমায় হতাশ করবেন না।" জুলাই মাসে মিঃ জিন্না ও গান্ধীজীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হল, আলোচনা হল কিন্তু কোন সুফল হল না। গান্ধীজী নিরাশ হলেন।

গান্ধী-ওয়াভেল আলোচনা—তখন গান্ধীজী ব্যতীত সকল কংগ্রেস নেতাই কারাগারে। অচল অবস্থা নিরসনের জন্য জুন মাসে সিমলায় ওয়াভেল এক নেতৃ-সম্মেলন আহ্বান করেন। তিনি তাতে বলেন, "কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করবার ক্ষমতা আমি পেয়েছি"। প্রস্তাব-গুলির আলোচনা হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে আলোচনা ব্যর্থ হয়। বড়লাটের আমন্ত্রণে গান্ধীজী বৈঠকে উপস্থিত হন। ওয়াভেল definite ও constructive policy চাইলেন। গান্ধীজী তাতে সম্মত হয়ে বললেন, "কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবে যে সত্যাগ্রহের কথা বলা হয়েছে আজকে পরিবর্তিত অবস্থায় তার প্রয়োজন নেই। কংগ্রেস এবার

সমরোত্তমে (তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই) ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করবে যদি ইংরাজ অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং কেন্দ্রে জাতীয় সরকার স্থাপন করে। তবে ভারত যুদ্ধের কোন ব্যয় বহন করবে না। আমি আপনারই হাতে। যতক্ষণ সম্মানজনক আপোষের বিন্দুমাত্র আশা থাকবে ততক্ষণ আমি আপনাদের দ্বারে ঘা দিয়েই যাব।” চতুর ইংরাজ বড়লাট সেই পুরাতন ওজুহাতের কথা উত্থাপন করলেন, “হিন্দু মুসলমান, তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ করে ঠিক করুন কি রকম শাসনতন্ত্র চান আপনারা ?” এদিকে রক্ষণশীল দলভুক্ত ও প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের চেলা ওয়াভেল গোপনে গোপনে মুসলিম লীগকে পাকিস্থানের দাবিতে অটল থাকতে নির্দেশ দেন। গান্ধীজী বললেন, “সরকারের এই জবাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যতদিন আমাদের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেবার শক্তি না হবে ততদিন ইংরাজ আমাদের উপর প্রভুত্ব করবে। ভারত আধ্যাত্মিক উপায়ে তা অর্জ্জন করবে।” দেশে তখন পাকিস্থান ও এন্টি-পাকিস্থান ফ্রন্ট তৈরী হচ্ছে। এই সময় ওয়াভেল-প্রস্তাব আলোচনা করার জন্য সরকার কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেয়। গান্ধীজী অন্তর্বর্তি সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

গান্ধী-জিন্না দ্বিতীয় আলোচনা—গান্ধীজী মিঃ জিন্নার মনের পরিবর্তনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। বোম্বাইতে ৯ই হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে আপোষের জন্য আলোচনা করলেন। কোনই ফল হল না। মিঃ জিন্না বললেন, “পাকিস্থান লাভ করে পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত সব রকম স্বার্থই মুসলমানকে ত্যাগ করতে হবে।” গান্ধীজী বললেন, “ভারতবাসী যদি স্বাধীন হতে চাও, যদি ভারতের মুক্তি চাও, হিন্দু মুসলমান এক হও।”

বাংলায় অবস্থান—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বরে গান্ধীজী বাংলায়

আগমন করেন। তিনি সোদপুরে খাদি-প্রতিষ্ঠানের আশ্রমে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি সর্বপ্রথম প্রার্থনা-সভার প্রবর্তন করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যেখানেই থাকতেন সেখানেই প্রত্যহ বৈকালে প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠিত হত। সোদপুরের উন্মুক্ত ময়দানে প্রত্যহ প্রার্থনার সময় প্রায় লক্ষাধিক লোক সমাগম হত। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা হতে প্রত্যহ বহু Special train যাতায়াত করত। বিবিধ ধর্মগ্রন্থ হতে শ্রেষ্ঠ বাণী ও সঙ্গীত সংকলন করে প্রথমে সভায় গীত ও পঠিত হত। সভাস্থ সকলে হাততালি দিয়ে ঐক্যতানে রামধুন গীত করত। তারপর গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনান্তিক বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতার বাণীগুলি তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। বাণীগুলি জাতির অমূল্য সম্পদ। (**'গান্ধী-কথামৃত'** নামে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রার্থনাসভার বাণীগুলি প্রকাশিত হয়েছে)। তিনি প্রার্থনার সম্পর্কে বলতেন, "মানুষের জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। প্রার্থনা দ্বারা মানুষের জীবন শান্ত হয়। প্রার্থনাই জীবন। সমবেত প্রার্থনার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পায়। সকলে একসঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রার্থনা করলে শক্তি লাভ হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় যে বিরাট শক্তি রয়েছে সমবেত প্রার্থনায় সেই শক্তির ঐক্য উপলব্ধি হয়।" গান্ধীজী ধ্যানস্থ হয়ে প্রার্থনা করতেন। প্রার্থনার দ্বারা তিনি স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় পৌছিয়েছিলেন।

গান্ধীজী ৩রা ডিসেম্বরে কলিকাতায় বাংলার গভর্ণর মিঃ কেসি ও বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয় আলোচনা হয়। ১৮ই ডিসেম্বর তিনি শান্তিনিকেতনে গমন করেন। সেখানে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মৃতি-হাঁসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২৪শে ডিসেম্বরে তিনি জলপথে গভর্ণরের লঞ্চে মেদিনীপুর যাত্রা করেন। আগষ্ট বিপ্লব দমন করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুরে

ভীষণ অত্যাচার করে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরে প্রবল ঝড়ে ডায়মণ্ড-হারবার, তমলুক ও কাঁথি মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়। এই সকল ধ্বংসলীলা তিনি নিজে পরিদর্শন করেন এবং জনসাধারণের নিকট তিনি গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কাহিনী শোনেন। তৎপর তিনি মেদিনীপুর হতে সোদপুরে ফিরে আসেন।

আসাম সফর ঃ—১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী গান্ধীজী আসাম মেলে সদলবলে গৌহাটি যাত্রা করেন। গৌহাটিতে তিনি প্রার্থনা সভায় বলেন, "কয়েক মাসের মধ্যেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে।" তিনি ১৫ই জানুয়ারী সোদপুর প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হন।

মন্ত্রী মিশন—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। (ক) যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ ও আমেরিকা Atlantic Charter নামে একটি সনদ রচনা করেন। তাতে সমস্ত দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি থাকে। (খ) ভারতের বাহিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বারা ভারত আক্রমণের উদ্যোগে ব্রিটিশরা পূর্বের মত আর দেশী সৈন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারল না। (গ) বোম্বাইতে দেশী নৌ-সৈন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। (ঘ) আগষ্ট বিপ্লবের অত্যাচারে আসমুদ্রহিমাচল প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। (ঙ) গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল চার্চিল দল পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারে না, ফলে শ্রমিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। এই সকল কারণে রণক্লান্ত ব্রিটিশ শক্তি ভারতের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য আগ্রহ দেখায়। গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমস্ত আইন প্রত্যাহার করে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৈধ

বলে স্বীকার করে। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য বিলাতে আহূত হন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ মিঃ এট্‌লির মন্ত্রিসভা ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও মিঃ আলেকজাণ্ডারকে লইয়া গঠিত একটি মিশন ভারতে প্রেরণ করেন। মিশন প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীন শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে পরামর্শ করা ও যথাসম্ভব শীঘ্র ক্ষমতা হস্তান্তর করা। মন্ত্রী-মিশন দিল্লীতে সকল দলের নেতাদের সঙ্গে তিন সপ্তাহ ধরে পৃথকভাবে আলোচনা করেন। সিমলায় মে মাসে কংগ্রেস ও লীগের সঙ্গে মিশনের আলোচনা হয়। এই সমস্ত বৈঠকে কংগ্রেসের উপদেষ্টা হিসাবে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। লীগ সার্বভৌম পাকিস্থান রাষ্ট্রের দাবি করে এবং কংগ্রেস ভারতের অখণ্ডতা দাবি করে। সেজন্য এইসব আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা—মন্ত্রীমিশনের আমন্ত্রণ গ্রহণকালে কংগ্রেস একটা সর্ত করে নেয় যে যদি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হয় তবে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা কার্যে পরিণত করতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৬ই মে মিশন এক দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা প্রকাশ করেন:—(১) মিশন লীগের সার্বভৌম পাকিস্থানের দাবি অস্বীকার করে। (২) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠিত হবে। (৩) প্রদেশগুলিকে তিনটি মণ্ডলে ভাগ করা হয়। (৪) নূতন শাসনতন্ত্র চালু হলে যে কোন প্রদেশ ইচ্ছানুযায়ী কোন মণ্ডলী হতে বের হতে পারবে। (৬) নূতন শাসনতন্ত্র গঠন না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তবর্তি সরকার গঠিত হবে। (৫) তিনটি মণ্ডলী পৃথক শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারবে। 'গ' মণ্ডলীতে মুসলমান-প্রধান বাংলা ও হিন্দুপ্রধান

আসাম ; 'খ' মণ্ডলীতে মুসলমান-প্রধান পাঞ্জাব, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও সিন্ধু। 'ক' মণ্ডলীতে বাকী প্রদেশগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

চতুর ব্রিটিশ শক্তি এই পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্থানের ভিত্তির বীজ গোপন রেখেছিল। মিঃ জিন্না বললেন, "ব্রিটিশ ও হিন্দুর অসম্মতি স্বত্বেও আমরা পাকিস্থান অর্জন করব। এই পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্থানের ভিত্তি রয়েছে। হিন্দুগণ শীঘ্রই বুঝতে পারবেন যে ইহা একটি চিনি-মাখান বড়ি। চিনি গলে গেলে আসল বড়ি বের হয়ে পড়বে।"

গান্ধীজী মিশনের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলেন, "কিছু ত্রুটি থাকলেও মিশন বর্তমানে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিকল্পনা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করতে পারেন না। ইহার দ্বারা ভারতের কোনও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ত নাই ; বরং এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সমর্থন করে কার্যে প্রবৃত্ত হলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হবে। ইহাতে সর্বদলের স্বার্থ সমন্বয়ের চেষ্টা রয়েছে।"

লীগ ও কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (গণ পরিষদ গঠনের প্রস্তাব) গ্রহণ করে। গণ-পরিষদ গঠিত হয়। গণ-পরিষদ সম্পর্কে গান্ধীজী কংগ্রেসকে আশীর্ব্বাদ ও পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বললেন, "আমি জানি যে প্রস্তাবিত গণ-পরিষদ সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। তাতে বহু ত্রুটি আছে। আমরা এত বৎসর ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছি। গণ-পরিষদের ঐ সকল ত্রুটিকে ভয় করব কেন? এই গণ-পরিষদকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করে দেখতে হবে। আমার বিশ্বাস ঠিকভাবে কার্য পরিচালনা করতে পারলে ইহা প্রকৃত স্বদেশী গণ-পরিষদে পরিণত হবে। আমি আমার পূর্ণসহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" তিনি বাংলা ও আসামে শ্বেতাঙ্গদের ভোট গ্রহণে ও বাধ্যতামূলক প্রাদেশিক মণ্ডলে যোগদানের কথায় আপত্তি জানান। গান্ধীজীর আবেদনে বাংলা ও

আসামের ইউরোপীয় দল গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন না।

স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা—কংগ্রেস সংখ্যাসাম্যের অর্থাৎ কংগ্রেস ও লীগের সমান সংখ্যক সদস্য গ্রহণের নীতিতে স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা (অন্তবর্তি সরকার গঠন) গ্রহণে আপত্তি জানায়। একে ত ভারতে মোট জনসংখ্যার ¼ অংশ মুসলমান আবার লীগের বাহিরে অসংখ্য মুসলমান রহিয়াছে। সেজন্য গান্ধীজী এই সংখ্যাসাম্যর নীতিকে অযৌক্তিক ও অন্যায় বলেন। কংগ্রেসের আপত্তিতে অন্তবর্তি সরকার গঠিত না হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট ২৯শে জুন একটি তদারকী সরকার (Caretaker government) গঠন করেন। ৩০শে জুন মন্ত্রীমিশন ব্যর্থ হয়ে ভারত ত্যাগ করেন। মিঃ জিন্না অন্তবর্তি সরকারে সমান সংখ্যক সদস্য লওয়ার প্রতিশ্রুতিতে প্রথমে গণ-পরিষদ গঠনের প্রস্তাবে রাজি হন কিন্তু কংগ্রেসের সংখ্যাসাম্যর আপত্তিতে ২৯শে জুলাই লীগ দুই পরিকল্পনাই প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) পালিত হবে বলে ঘোষণা করে।

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ১৬ই আগষ্ট (১৯৪৬) কলিকাতায় গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। এই বিশাল সহরে চারিদিন নরহত্যা, সম্পত্তি লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী ধ্বংস অবাধে চলতে থাকে। কত লোক যে নিহত হল, কত লোক যে সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারী হল তার কোন সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এইরূপ ভীষণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ভারতে পূর্বে কখনও সংঘটিত হয়নি। চারদিন সমস্ত শাসনযন্ত্র অচল হয়ে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়, যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হয়, পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করে। বড়লাটের আমন্ত্রণে ২রা সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল অন্তবর্তি সরকার গঠন করেন। লীগ প্রথমে এই সরকার বয়কট করে, পরে

১৫ই অক্টোবর ইহাতে যোগদান করে। অন্তবর্তি সরকার গঠনের দিনে (২রা সেপ্টেম্বরে ১৯৪৬) গান্ধীজী বলেন, "সমগ্র ভারত আজ এই শুভদিনটির জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। এই দিনটির জন্য তারা অশেষ দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে অন্তবর্তি সরকার গঠিত হওয়ায় এখন বলতে পারা যায় এতক্ষণে স্বাধীনতা লাভের পথ উন্মুক্ত হল। আজ এক চিরস্মরণীয় দিন।...নূতন সরকারের প্রথম কাজ হবে লবণকর রহিত করা তাহলে দরিদ্রতম লোক বুঝতে পারবে যে স্বাধীনতা সমাগত। এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক সংপ্রীতি স্থাপন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, খাদি প্রচার, নূতন সরকারের কার্যতালিকাভুক্ত করতে হবে।"

গান্ধীজীর কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষা

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ—১৬ই আগষ্ট (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে) কলিকাতার মহা-হত্যার (The great killing) কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে ১০ই অক্টোবর হতে এক সপ্তাহকাল নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় দু'শত বর্গ মাইল স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ হাজার লোক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের উপর ব্যাপক ও বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নরনারী শিশু হত্যা, গবাদিপশু হত্যা ও অপসরণ, হিন্দুনারী ধর্ষণ ও হরণ, জোর পূর্বক বিবাহ, পাইকারিভাবে গ্রামসুদ্ধ হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ ও তাদের নিকট হতে হাজার হাজার টাকা জরিমানা আদায়, হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ও অপবিত্রকরণ, মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার অবাধে চলতে

থাকে। পূর্ব হতে সেতু ভেঙ্গে, পথ অবরুদ্ধ কোরে, খাল বাঁধ দিয়ে বদ্ধ কোরে, ডাকঘর ধ্বংস কোরে, টেলিগ্রাফ তার কেটে যোগাযোগের সর্বপ্রকার সূত্র বিচ্ছিন্ন করা হয়। সেজন্য এইসব ধ্বংসলীলার সংবাদ ঘটনার পাঁচ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছায় না। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়—সাড়ে চার হাজার গৃহ লুণ্ঠিত হয়, নয় হাজার গৃহ ভস্মীভূত হয়, ২৮৫ জন নিহত হয়। অপহৃতদের ও ধর্মান্তকরণদের সংখ্যা নির্ণয় হয় নাই। যারা অত্যাচারের হাত হতে কোন রকমে নিষ্কৃতি পেল, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে সাতপুরুষের ভিটাত্যাগ করে দেশ দেশান্তরে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল বিহারে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের বর্বর নিষ্ঠুরতায়। সেখানেও নির্দোষ মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অত্যাচার চরমে উঠল। বোম্বাই, আমেদাবাদ ও যুক্তপ্রদেশে এই রকম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেধে গেল।

গান্ধীজীর চিন্তা ও অগ্নি-পরীক্ষার সংকল্প ঃ—দিল্লীতে গান্ধীজী এই সকল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নিদারুণ সংবাদ পেয়ে খুব মর্মাহত হলেন। একদিকে অত্যাচারের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও অত্যাচারিতদের ভয়-বিহ্বলতা, অপর দিকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা তাঁকে খুব বিচলিত করল। এতদিন যে সকল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল তার পিছনে কোন ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল না। মসজিদের সামনে বাজনা বাজান, গো হত্যা এই বিষয় নিয়ে কোথাও কোথাও সংঘর্ষ হত। বর্তমানে দুইজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। এই সংঘর্ষ সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ভারতময় ছড়িয়ে পড়তে দেখে তিনি খুব শঙ্কিত হলেন। তিনি দিল্লীর প্রার্থনা সভায় বললেন, "যে দিন থেকে আমি নোয়াখালি ও

বিহারের কথা শুনেছি সে দিন থেকে আমি আমার কর্তব্যর কথা ভাবছি। ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাবেন। লোকে আমাকে ভালবাসে। এই একটি পথেই আমি এর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে পারি। তা হল যে-সত্যের অনুশীলনে আবার জীবন উৎসর্গ করেছি সে-সত্যকে জনসাধারণের সম্মুখে এবং তাদের মধ্য দিয়ে জগতের সম্মুখে তুলে ধরা। আমি নোয়াখালি যাব মনস্থ করেছি। আমি নারীর চোখের জল মুছাতে, তাদের সাহস দিতে ও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করতে যাচ্ছি। আমার স্বাস্থ্য ভাল নয় তবুও কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। সে কর্তব্য সহজসাধ্য করবার জন্য ভগবানে বিশ্বাস রাখা দরকার। আমার নোয়াখালি অভিযানের সিদ্ধান্ত অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়। যতদিন আমি বংলায় না যাই ততদিন আমি হৃদয়ে শান্তি পাবনা।”

নোয়াখালি অভিযানের উদ্দেশ্য—মনুষ্য-হৃদয়ের চিরন্তন নৈতিক ভিত্তির উপর এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উপর ও নিজের আত্মশক্তির উপর চরম বিশ্বাস নিয়ে গান্ধীজী নিঃশঙ্কচিত্তে নোয়াখালিতে সত্যের ও অহিংসার নূতন পরীক্ষা করতে চললেন। যে মনুষ্যত্ব পশুত্বের পঙ্কিল আবর্তে ডুবে গিয়েছে অধ্যাত্ম শক্তির দ্বারা তাকে আবার মনুষ্যত্বের স্তরে টেনে তোলা যায় কিনা ইহাই ছিল গান্ধীজীর নূতন পরীক্ষা। তিনি এই অভিযানকে অহিংসার কঠোরতম পরীক্ষা ও ধর্ম-বিশ্বাসের নিঃশঙ্ক অভিযান বলে বর্ণনা করেন। রক্ত-পিপাসু মানুষের জিঘাংসা জয় করবার জন্য এই অভিযান। সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে সমস্ত জাতিকে বাঁচাবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—হয় এই বিষ নিঃশেষে পান করে নীলকণ্ঠ হবেন, না হয় বিষে জর্জরিত হয়ে মৃত্যু বরণ করবেন। তিনি

নোয়াখালির ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক ভাবে দেখেন নাই। নোয়াখালির সংকীর্ণতর অঞ্চলের ঘটনার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর ঋষিকল্প দূরদর্শিতায় তিনি এই সকল ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মধ্যে সমগ্র ভারতের বৃহত্তর বিপদের সম্ভাবনা দেখতে পান। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি একবার জাগ্রত হলে সমগ্র ভারত নগ্ন বর্বরতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তার ফল হবে মনুষ্যত্বের মৃত্যু, দেশের ও জাতির সর্বনাশ, স্বাধীনতার সংকট। তিনি বললেন, "পূর্ব বঙ্গের এই সমস্যা স্থানীয় সমস্যা নহে, ইহা নিখিল ভারত সমস্যা। যদি প্রতিশোধ প্রবৃত্তিই জাগ্রত হয় তবে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানগণ যে সব নৃশংস কার্য করেছে বলে প্রকাশ, জয়লাভ করবার জন্য হিন্দুদিগকে তা থেকে আরও বেশী নৃশংস হতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিটলারের বিরুদ্ধে হিট্‌লারের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা নৃশংসতায় হিট্‌লারকেও অতিক্রম করেন।"

এই ব্যাপক ভ্রাতৃ-কলহ গান্ধীজীর জীবনে এক নূতন সমস্যা নিয়ে এল। তিনি এই সমস্যাকে অহিংসা ও সত্যের কষ্টি-পাথরে সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে নূতন করে পরীক্ষা করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নূতন আলোকের সন্ধানে নিজের মহামূল্য জীবন ও সন্তানপ্রতিম শিষ্য ও শিষ্যাদের জীবন উৎসর্গ করলেন।

নোয়াখালি অভিযানের বিশেষত্ব—নোয়াখালির অভিযানকে একমাত্র মুসলমানদের অত্যাচার হতে হিন্দুদের রক্ষার অভিযান ভাবা অন্যায় হবে। ইহা যে কোন অত্যাচারিত সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার ও সাহসের ভাব উদ্রেকের এবং অত্যাচারীর মনে মনুষ্যত্ব জাগ্রতের অভিযান। ইহা হিন্দু-মুসলমানের উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রযোজ্য। নোয়াখালি অভিযান গান্ধীজীর জীবনে অহিংসার সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। তিনি এই

পরীক্ষার বিষয় বলেন, "আমি জীবনে এত বড় গুরু দায়িত্ব কখনও গ্রহণ করিনি; হয়ত ইহা আমার জীবনের শেষ কাজ। আমি যদি অক্ষত দেহে এখান হতে ফিরি তা হলে আমি পুনর্জন্ম লাভ করেছি মনে করব। আজ অহিংসার চরম পরীক্ষা চলবে, এমন পরীক্ষা পূর্বে কখনও হয়নি। আমি সকলের দুঃখের ভাগ নিতে যাচ্ছি।"—"নোয়াখালিতে এমন এক সম্প্রদায় আছেন যাঁরা আমাকে একদিন বন্ধুত্বের চোখে দেখতেন কিন্তু আজ সেই সম্প্রদায়ই আমাকে শত্রু বলে মনে করছেন. তাই আমার নিজের জীবন ও কর্মসাধনা দ্বারা আমাকে প্রমাণ কর্তে হবে যে আমি ত শত্রু নই পরন্তু মুসলমানদের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী। সেজন্য মুসলমান সংখ্যাধিক্য নোয়াখালিকেই আমার জীবনের বৃহত্তম পরীক্ষাগার নির্বাচন করেছি।" তিনি নোয়াখালি যাত্রার প্রাক্কালে বলেন, "আমি কারও বিচার করতে বাংলায় যাচ্ছি না। আমি সেবকের অধিকারী হিসাবে বাংলায় যাচ্ছি। হিন্দু মুসলমান কেহ কারও শত্রু নয়। ভারতবর্ষে তারা জন্মেছে, ভারতবর্ষে তারা লালিত পালিত হয়েছে, ভারতবর্ষে তারা মরবে। ধর্মের পার্থক্য এই সত্য বদলাতে পারে না।"

নোয়াখালি যাত্রা—গান্ধীজী ২৯শে অক্টোবর সোদপুর পৌছান। তিনি প্রার্থনা-সভায় বলেন, "মানুষ আজ পশুর ন্যায় নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছে। এই বিবাদ কলিকাতা, বাংলা, বিহার, ভারত বা জগতের কোন উপকারে আসবে না।…এই আত্মঘাতী কলহ যাহাতে বন্ধ হয়ে পুনরায় উভয় সম্প্রদায় একপ্রাণ হয় তজ্জন্য আপনারা এই প্রার্থনায় সবাই যোগ দেন, ইহাই আমার কাম্য। আমি শিশুকাল থেকে অন্যায়কে ঘৃণা করতে শিখেছি কিন্তু অন্যায়কারীকে ঘৃণা করিনি। মুসলমানরা যদি কোন অন্যায়ও করে থাকে তবুও তাঁরা আমার বন্ধুই

থাকবেন।···বিহারের ঘটনাবলীর কথা শুনে আমি অপরিসীম বেদনা বোধ করছি। রক্তপাত করা হয়েছে—অতএব রক্তপাত করেই উহার প্রতিশোধ নিতে হবে ইহা বর্বরের নীতি। কতিপয় মুসলমান উদ্বেগের দরুণ পলায়ন করতে চেষ্টা করলে বিহারি হিন্দুরা তাদের হত্যা করেছে—এই সংবাদ শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছি।···সমগ্র মানবসমাজকে নিজের পরিবারের লোক মনে করাই বিশ্বের সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সহজ উপায়।···আমি বিহার যাই সুরাবর্দ্দী সাহেব ও অন্য মন্ত্রীবর্গ এই ইচ্ছাই প্রকাশ করেন। ···আমি ঈশ্বরের দাস—তাঁর ইচ্ছানুসারেই কাজ করব।...আমি আশাবাদী, দুই সম্প্রদায়কে কেন এক করা যাবে না? আমি এই মিলনের আলোক দেখতে পাচ্ছি। নোয়াখালিতে গিয়ে আমি আমার শক্তির পরিমাণ করব। প্রয়োজন হলে বাংলার মাটিতেই অস্থি-পঞ্জর ফেলে যাব। নোয়াখালি যাত্রার পূর্বে আমি ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারি না।” গান্ধীজী প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দি সাহেবের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। তিনি মন্ত্রীমণ্ডলের অজ্ঞাতসারে ও অনুমোদন ব্যতীত কোন কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কখনই কোন কিছু গোপন রাখতে চেতেন না, তিনি এতই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

নোয়াখালিতে গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতি—:—গান্ধীজী এই অভিযানের সফলতার জন্য পর পর তিনটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন; (১) সদলবলে গ্রামের ধ্বংসলীলা পরিদর্শন, (২) শ্রীরামপুরে একক বাস, (৩) পল্লী-পরিক্রমা।

গান্ধীজী প্রথম ক'দিন নিজে কয়েকটি গ্রামের ধ্বংসলীলা পরিদর্শন করেন এবং মুসলমানদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেন। তাঁদের হৃদয় জানবার জন্য তাঁর অসীম আগ্রহ দেখা যায় কারণ তিনি বুঝতেন—

হৃদয় না জানলে হৃদয় জয় করা যায় না। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং স্থির ও প্রশান্ত চিত্তে তাঁদের ধিক্কার ও ভালবাসা দুইই গ্রহণ করেন। তাঁদের অন্তরের অভিযোগ প্রকাশে তিনি উৎসাহ দেন। প্রথমে কতকগুলি দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোক সরল প্রাণ অশিক্ষিত পল্লীবাসী মুসলমানদের মধ্যে গান্ধীজীর নোয়াখালি ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে গান্ধীজীর নিরাপত্তার জন্য তাঁর সঙ্গে অনেক সশস্ত্র পুলিশ থাকত। ইহাতে মুসলমানরা গ্রেপ্তারের ভয় পায়। এই দুই কারণে গান্ধীজীর গ্রাম পরিদর্শনের প্রথমাবস্থায় মুসলমানরা তাঁকে পরিহার করে চলত। মুসলমানদের হিন্দুদের প্রার্থনা-সভায় যোগদান ও হিন্দু দ্বারা কোরাণ ব্যাখ্যা ও আবৃত্তি মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্ম বিরুদ্ধ বলে স্থানীয় মুসলমানরা আপত্তি জানায়। তিনি নোয়াখালির বাহির হতেও ইহার প্রতিবাদে বহু পত্র পান। তিনি তদুত্তরে বলেন, “আমি অবতার বা ধর্মগুরু নহি, অতি সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হতে নির্বাচিত শ্লোকগুলি প্রার্থনা সভায় আবৃত্তি করা হয়। এক মুসলমান বন্ধুর অনুরোধে কোরাণ আবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। খোদাও যে রামও সে। খোদার নাম গণনা করে শেষ করা যায় না। ঈশ্বর এক। প্রার্থনা সভায় যোগ দিলে ধর্মচ্যুতির কোন সম্ভাবনা নাই। আমি দেখতে চাই হিন্দুরা খাঁটি হিন্দু হউন, মুসলমানরা খাঁটি মুসলমান হউন।”

গান্ধীজীর কল্যাণকামী ও দরদী প্রাণের পরিচয় পেয়ে দিন দিন প্রার্থনা সভায় মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সভায় বহু মুসলমান নেতা হিন্দুদিগের নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা তাঁদের সহকর্মীদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেন। মুসলমানদের বাড়ীতে গান্ধীজীর নিমন্ত্রণের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তিনি অবাধে

সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, শারীরিক ক্লেশ সত্ত্বেও আগ্রহের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। পরমাত্মীয়ের মত তিনি সকলের সুখদুঃখের খোঁজ-খবর নিয়েছেন, বালক-বালিকাদের সঙ্গে রসিকতা কোরে গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়াকে আনন্দমুখর করেছেন। প্রার্থনা সভায় ও পরিক্রমার পথে "রাম ও রহিম" "কৃষ্ণ ও করিম" "ঈশ্বর ও আল্লা" প্রভৃতি নাম কীর্তনে মুসলমানরা যোগ দিয়েছেন। অনেক মুসলমান নারীও তাঁর মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে কাজিরখিলে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখান হতে "শান্তিমিশন দিনলিপি" নামক দৈনিক পত্র (সাইক্লোষ্টাইলে) ছাপা ও প্রকাশিত হত। এতে কর্মীদের প্রতি গান্ধীজীর নির্দেশ ও তাঁর দৈনন্দিন কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ থাকত। কাজির-খিলে ব্যাটারির দ্বারা পরিচালিত বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত বিশ্বের সংবাদ লিপিবদ্ধ করে গান্ধীজীর নিকট প্রেরিত হত। 'রিলিফ' বিভা-গের অধীনে হাঁসপাতাল পরিচালিত হত। এই সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা বিভাগের কাজও পুরোদমে চলতে থাকে। তিনি গ্রামের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধনেও ব্রতী হন। তিনি নিজে ও ডাঃ সুশীলা নায়ারের দ্বারা বহু রোগীর চিকিৎসা করেন। এই সময় তাঁকে এত অধিক কাজে ব্যাপৃত থাকতে হত যে তিনি কোন কোন দিন রাত্র দুইটায় শয্যাত্যাগ করতেন।

নোয়াখালিতে থাকলেও গান্ধীজী বিহারের দাঙ্গা সম্পর্কেও বিহার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। তিনি বলেন, "আমি নোয়াখালি হতে বিহারের কাজ করছি।" এই দুর্গম পল্লীতে পণ্ডিত নেহেরু, রাষ্ট্রপতি কৃপালনী, মিঃ আসফ আলি,, আসামের প্রধানমন্ত্রী বরদোলী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ও বহু দেশী-বিদেশী সাংবাদিক রাষ্ট্রগুরুর

সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতে ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তাঁর উপস্থিতিতে এই জনবিরল নিভৃত পল্লীগুলি চঞ্চল ও কর্মমুখর হয়ে উঠল। পল্লীপথ যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হওয়ায় নেতৃবৃন্দদের অনেকখানি পথ পদব্রজে গমন কোরে গান্ধীজীর কুটিরে পৌছাতে হত। পণ্ডিত নেহেরু রামগঞ্জ থেকে দারুণ শীতের মধ্যে তিন মাইল পথ হেঁটে রাত্র বারটার সময় তাঁর কুটিরে পৌছান। সাংবাদিক দল পৃথক শিবিরে বাস করতেন।

এইবার আমরা এই সকল কর্মপদ্ধতির বিশদ বিবরণ দিচ্ছি।

(১) **সদলবলে ধ্বংস লীলা পরিদর্শন**ঃ—৭ই নভেম্বর গান্ধীজী সদলবলে চৌমুহানী পৌছান। দত্তপাড়া ও কাজিরখিলে শিবির স্থাপন কোরে ৭ই হইতে ১৭ই পর্য্যন্ত গান্ধীজী উপদ্রুত অঞ্চলের বারটি গ্রামের ধ্বংসলীলা নিজে পরিদর্শন করেন। গ্রামবাসী নরনারী অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর নিকট তাদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনী বর্ণনা করে। তিনি কোথাও ভস্মী-ভূত প্রাসাদোপম গৃহের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও মাটীতে প্রোথিত ও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত নরকংকাল, কোথাও মাটিতে রক্তের চিহ্ন, কোথাও বিক্ষিপ্ত আসবাবপত্র, কোথাও পরিত্যক্ত কুটির প্রভৃতি ধ্বংসকার্য্যের মর্মান্তিক দৃশ্য বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেন। বহু আশ্রয়প্রার্থী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এক সময় তাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, তখন তারা পথের ভিখারী, পরণে জীর্ণ বস্ত্র, দেহ কঙ্কালসার, মুখে আতঙ্কের ছায়া। নারীদের দেহে সধবার চিহ্ন শাঁখা সিন্দুর পর্য্যন্ত ছিল না। তিনি তাহাদিগকে বলেন, "আমি ভাবতেই পারি না কেহ কাহাকেও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে পারে বা কোন নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারে। পুলিশ ও সৈন্য ভীরুদের রক্ষা করতে পারে না। যতদিন একটি বালিকা পর্যন্ত দুর্বৃত্তের

ভয় করবে ততদিন আমি বাংলা ত্যাগ করব না। প্রয়োজন হলে আমি এখানেই অস্থি-পঞ্জর ফেলে যাব। আমি তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া চলে যেতে আসি নাই। আমি আপনাদের মধ্যে বাস করতে এসেছি।"

"আল্লা-হো-আকবর ধ্বনিতে কাহারও ভীত হওয়া উচিত নয়। ঐ ধ্বনির অর্থ ভগবান সর্বশক্তিমান। কোন সত্যিকারের মুসলমান এই সকল কুকার্যে অংশ গ্রহণ করেননি। অদূর ভবিষ্যতে নোয়াখালি ত্যাগ করার সংকল্প আমার নাই, আমি আপনাদের একযোগে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে নিষেধ করি। আপনাদের সর্বাপেক্ষা বড় শক্র হচ্ছে ভয়। আপনারা অন্তর থেকে ভয় দূর করুন। তাতে আমাকে সাহায্য করা হবে। জনসাধারণ কর্তৃক নির্ভীকতার অনুশীলন না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে শান্তি নাই।" তিনি সকলকে সাহসী হতে বলেন, "আমার পথ ভিন্ন; আমার সাধনা অনন্যসাধারণ। নিজের মনোবলই একমাত্র রক্ষাকর্তা, অপর কেহ নয়। সাহসীকে কেহ অপমান করতে পারে না। আত্মাকে কেহ ধ্বংস করতে পারে না। গান্ধী ছাড়া গান্ধীকে কেহ ধ্বংস করতে পারে না। হিন্দুদের পক্ষে ভয়ে পালান উচিৎ নয়। ঈশ্বর ছাড়া মানুষের ভয়ের বস্তু আর কিছুই থাকতে পারে না।" "অহিংসা বীরের ধর্ম, কাপুরুষের নয়। সর্বপ্রকার ভীরুতা বর্জন করে বীরের অহিংসা অর্জন কর। অহিংসার পূজারী প্রচণ্ডতম শক্তির নিকটও মস্তক অবনত করবে না। সর্বস্ব ত্যাগ করবে। আক্রমণকারীর উপর কোন বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না করে যদি প্রসন্ন চিত্তে তার প্রহার ক্ষমা করতে সক্ষম হই, তবে আমরা সাহসীর অহিংসা প্রদর্শন করব। ঘোর বিরুদ্ধবাদীরাও আমার বীরত্বের প্রশংসা করবে। যদি কেহ বীরোচিত অহিংসা অবলম্বন করতে অসমর্থ হয়, তবে আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে বাহুবলের আশ্রয় লওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার দেশবাসী নিরস্ত্র, অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ হতে তারা

বঞ্চিত, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাই একান্ত প্রয়োজন নয়। আত্মরক্ষার জন্য চাই বাহুতে শক্তি, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন মনের আত্মিক শক্তি। কাপুরুষতা হিংসার চেয়ে খারাপ।"

(২) **শ্রীরামপুরে একক বাসঃ**—মানুষ যদি সত্য ও অহিংসার সত্যিকারের পূজারী হয়, কর্মে যদি নিষ্ঠার অভাব কোন দিন না হয় তবে তাঁর আহ্বান অপরের চিত্তে সাড়া জাগাবে—ইহাই গান্ধীজীর জীবন-দর্শন। ইহাই তাঁর সকল কাজের প্রেরণা যোগায়। এই কয়দিন পরিভ্রমণের পর মুসলমানদের মনে কোন সাড়া জাগতে না পেরে তিনি বিচলিত হলেন। তিনি হিংসা ও অসত্যের ঘোর সূচীভেদ্য তমসার মধ্যে কোন আলোকের সন্ধান পেলেন না। তিনি অহিংসার কর্মপদ্ধতি পরীক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একক বাসের সংকল্প করলেন। তিনি একটি মর্মস্পর্শী বিশদ বাণীতে বলেন, "আমি অতিরঞ্জন ও অসত্যর মধ্যে বাস করছি। সত্যের সন্ধান পাচ্ছি না। পরস্পরের প্রতি তীব্র অবিশ্বাসে পুরাতন বন্ধুত্বের গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ষাট বৎসর যাবৎ যে সত্য ও অহিংসা আমাকে রক্ষা করেছে এবং সকল কর্মে প্রেরণ যোগাইয়াছে তা দেখতে পাচ্ছি না। নিজের উপর অহিংসার নূতন করে পরীক্ষার জন্য আমি সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রীরামপুরে একা বাস করব। এতদিন আমি বহুসঙ্গীর সঙ্গে থেকেছি। আজ আবার মন বলছে সময় আগত, নিজেকে যদি ভাল করে জানতে চাও, তবে অগ্রসর হও, একলা চল। তাই আমি একা চলেছি ভগবানের উপর অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে সমস্ত বাধা উপেক্ষা করতে ও নির্য্যাতিতদের মনে আস্থা জাগাতে। আমার সঙ্গীরা সতীশ বাবুর নির্বাচন মত বিভিন্ন গ্রামে শান্তি-স্থাপন ও সংগঠন-কার্যে আত্মনিয়োগ করবেন। ....স্থানীয় কোন লীগপন্থী পরিবারে বাস করাই আমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু সে সুদিনের আশায় বসে থাকা উচিত নয়। মুসলমানদের

সংস্পর্শে আসবার চেষ্টা করব। লীগের নিকট আমার প্রস্তাব-প্রত্যেক উপদ্রুত গ্রামে আমার সঙ্গে একজন সৎ ও সাহসী মুসলমান এবং একজন সৎ ও সাহসী হিন্দু দিন। প্রয়োজন হলে জীবনের বিনিময়ে তাঁরা প্রত্যাবর্তনেচ্ছুক আশ্রয়প্রার্থীদের নিরপত্তা রক্ষা করবে। ……আমার মনে হয় পল্লীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন এখনও নিরাপদ নয়। সেজন্য তারা বাসভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যৎসামান্য খাদ্যে জীবিকানির্বাহ করাই ভাল মনে করছে। ……আমি নিষ্ঠার সঙ্গে অহিংসার পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য চিঠিপত্রাদি ও প্রবন্ধ লেখা বন্ধ রাখব। আলোর সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্য কাহাকে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে এখানে আসতে নিষেধ করি। …… দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন ও গ্রামে সহজ জীবনযাত্রা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত আমি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করব না। ইহা ভিন্ন পাকিস্থান বা হিন্দুস্থান কিছুই হতে পারে না। পরস্পর বিরোধের দ্বারা ভারতের দাসত্ব কোন দিন ঘুচবে না।"

২০ শে নভেম্বর পরিণত ৭৮ বৎসর বয়সে গান্ধীজী কাজিরখিল ত্যাগ কোরে চার মাইল পশ্চিমে শ্রীরামপুরে নৌকা যোগে গমন করলেন, সঙ্গে ছিল অনুরক্ত ভক্ত ষ্টেনোগ্রাফার শ্রীপরশুরাম ও দোভাষী অধ্যাপক শ্রী নির্মল চন্দ্র বসু। তাঁর সঙ্গীগণ ও সোদপুর, আশ্রমের কর্মীগণ বিভিন্ন দলে দশটি গ্রামে (চোঙ্গীরগাঁও, কড়পাড়া, ভাটিয়ালপুর, পরকোট, পাণিয়ালার, চরমণ্ডল, মান্দোরা, দশঘরিয়া, আমিষপড়া, কাজির খিল) গ্রামসেবা, পুনর্বসতি ও শান্তি-মিশনের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। প্রত্যেক দলে দু'জন করে কর্মী ছিলেন, একজন বাঙ্গালী ও একজন অন্য প্রদেশীয়। তাদের উপর নির্দেশ ছিল, 'মন হতে মৃত্যু ভয় দূর কর, প্রেম, অহিংসা ও সত্য দিয়ে বিরুদ্ধবাদিদের চিত্ত জয় কর। প্রয়োজন হলে প্রাণের বিনিময়ে সংখ্যালঘুদের প্রাণ-মান রক্ষা কর।' এই সময়

তিনি ২০ দিন যাবৎ বিহারের ঘটনার প্রায়শ্চিত্তের জন্য অর্ধাহার গ্রহণ করছিলেন। শরীরের ওজন অনেক কমে গিয়েছিল। শীতকালে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাঁর শরীর দুর্বল হয়েছিল। তিনি কাশিতে ভুগছিলেন। তবুও সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কর্তব্য সাধনে তিনি বরাবরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিদায় কালে তাঁর অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল। গান্ধীজী শ্রীরামপুরে ধান ক্ষেতের মধ্যে একটি টিনের ছোট ঘরে বাস করেন; চারিদিকে নারিকেল সুপারির বাগান; এখানে রান্না করা, বিছানা করা, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা প্রভৃতি নিজের কাজ নিজের হাতে করতেন। এই বাড়ীটার নাম "রাজবাটি"। ঘন বনানী বেষ্টিত নির্জন আশ্রমের শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে তিনি অহিংসার পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গ্রামের মুসলমানদের সঙ্গে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করেন, তাঁদের মধ্যে সহনশীলতা ও সহযোগিতার বাণী প্রচার করেন এবং গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করেন। তাঁর নির্দেশে অনেক গ্রামে উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে শান্তি-কমিটি গঠিত হয়। তিনি অনেক মুসলমানের বাড়ীতে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন। গ্রামের লোক সংখ্যা, শিক্ষিতের সংখ্যা, কোরান পাঠকের সংখ্যা ও আর্থিক অবস্থা, তাঁতি, কামার, ছুতার প্রভৃতি শ্রমশিল্পীর অবস্থা প্রভৃতি তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। তিনি সকলকে মন দিয়ে গ্রামোন্নয়নের কার্য করতে অনুরোধ করেন কারণ গ্রামগুলি ভারতের আত্মাস্বরূপ। গ্রামের কল্যাণেই ভারতের কল্যাণ। বাংলার তদানীন্তন শ্রমসচিব ও কয়েকজন সরকারী কর্মচারী তাঁর গ্রাম পরিভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন।

গান্ধীজীর উপস্থিতিতে হিন্দুদের মধ্যে কতকটা নির্ভয়তা ফিরে আসে। গ্রামে হিন্দুগণ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মাঝে মাঝে কীর্তন করতে করতে গান্ধীজীর

কুটিরে আসত। গ্রামের অধিকাংশ ডাক্তার হিন্দু ছিল। তাঁরা আতঙ্কে গ্রাম ত্যাগ করায় মুসলমান অধিবাসীদের রোগে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। গান্ধীজী প্রত্যহ ছয় মাইল হেঁটে রোগীদের সেবা করতেন। তাঁর কুটিরেও অনেক রোগী চিকিৎসার্থে উপস্থিত হত।

তিনি শ্রীরামপুরে বিভিন্ন প্রার্থনা-সভায় বলেন, "ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক দল বিশেষের উপর অহিংসা সমপ্রভাবশীল এবং উহা প্রমাণ করবার জন্য বর্তমান কাল প্রকৃষ্ট সময়।" "মুসলমানদের বিরূপ মনোভাবের নিকট নতি স্বীকার না করে তাঁদের মধ্যে সাহসের সঙ্গে বাস করা ও সত্য হতে বিচ্যুত না হওয়া উচিৎ। সংস্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগও ঘটাতে হবে। মানসিক সাহস ও চরিত্রবত্তার মধ্যে যে সুষ্ঠু বিবেচনা শক্তি নিহিত থাকে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সঙ্কটকালে কখন মনোভাব ব্যক্ত করতে হবে, কখন নীরব থাকতে হবে, কখন কাজ করতে হবে, কখন নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে তা জানা দরকার।"

"আমি আলোকের সন্ধানে আছি। আমার চতুর্দিকে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। কিন্তু কোন সত্যের নির্দেশে আমি কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হই। এজাতীয় মর্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে আমার উপযুক্ত ধৈর্য্য ও কর্মকুশলতা আছে বলে মনে হয় না। মানুষের দুর্গতি ও অধোগতি প্রায়শঃ আমাকে অভিভূত করে ফেলে। আমি আমার নিজের অক্ষমতায় মর্মপীড়া অনুভব করি।···আমার বন্ধুরা আমাকে যেন বরদাস্ত করেন। এই অন্ধকার বিদূরিত হবে।" "আমি জলন্ত অগ্নি পরিবৃত্ত হয়ে বাস করছি। যে পর্যন্ত অগ্নি নির্বাপিত না হয় সে পর্যন্ত আমি এস্থান ত্যাগ করব না। শুধু দুর্গত নরনারীর হিতসাধনের মধ্যে জীবন ধারণের সার্থকতা।" "গঠনমূলক কার্য চালিয়ে যেতে হবে। অপহৃতাদের উদ্ধার করতে ও তাদের নৈতিক সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে। গ্রামে

নূতন ভিত্তি রচনা করতে হবে। আমি আপনাদের মধ্যে বাস করতে এসেছি।" "আমাদের জীবন ভগবানের দান, তিনিই উহা নিয়ে যাবেন। ভগবানের উপর যার সামান্য মাত্র বিশ্বাস আছে তিনি সর্বভয়মুক্ত। নির্ভয় হতে পারলেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী মৈত্রী স্থাপিত হবে।" "এমন একদিন ছিল যখন মুসলমানরা আমার উপদেশ মেনে চলতেন কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন হিন্দুদের মধ্যেও খুব বেশী লোক আমাকে মানে না।" "গ্রাম সমূহ দেশের গলিত ক্ষতের মত দাঁড়িয়েছে। গ্রামবাসীরা কীটপতঙ্গের মত বসবাস করছে। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর হ.ল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে।"

"বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের কথা ও বাংলার ভগ্নীদের দুর্দশার কথা আমার অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। এতদিন লেখা বা বক্তৃতার দ্বারা আমি কিছুই করতে পারি নি। আমি মনে এই যুক্তি উপস্থিত করলাম যে আমি ঘটনাস্থলে যাব এবং যে নীতি আমাকে পোষণ করেছে এবং আমার জীবনধারণকে সার্থক করেছে উহার অভ্রান্ততা পরীক্ষা করব—অহিংসা কি দুর্বলের অস্ত্র বা বলবানের অস্ত্র। সে জন্য আমার সমস্ত কার্যকলাপ রেখে দিয়ে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি তাহা নির্ধারণের জন্য তাড়াতাড়ি নোয়াখালি এসেছি। আমি দৃঢ়ভাবে জানি অহিংসা একটি ক্রটিহীন যন্ত্র। যদি আমার হাতে উহা কাজ না করে তা হলে ক্রটি আমার, আমার যন্ত্র ব্যবহারেরা পদ্ধতিতে ক্রটি আছে। দূর হতে আমি ভুল খুঁজে পাই নি। সেজন্য উহা খুঁজে বের করবার চেষ্টায় আমি এখানে এসেছি। আলো না দেখা পর্যন্ত এখানে অন্ধকারে থাকতে হবে। কখন আলো আসবে একমাত্র ভগবান জানেন।

(৩) **পল্লী-পরিক্রমা** ঃ—শ্রীরামপুরে দেড়মাস নির্জন বাস করেও

তাঁর সাধনা অভীষ্ট ফল প্রদান করল না। ঘন অন্ধকারের মধ্যে তিনি আলো দেখবার জন্য আরও ব্যাকুল হলেন। অবশেষে তিনি একা পদব্রজে পল্লী-পরিক্রমার সংকল্প করলেন। মানব-বন্ধু, নিরহঙ্কার, পরম সহিষ্ণু, অহিংসার প্রতিমূর্তি গান্ধীজী চললেন মহাতীর্থ যাত্রায় রোষ-ক্ষোভ-ভয়হীন অন্তর নিয়ে। গান্ধীজীর এই পল্লী-পরিক্রমা অভিনব অভিযান। পূর্বেকার সব আন্দোলনকে অতিক্রম করেছিল এই অভিযান। তিনি এবিষয় বলেন, "এবার আমার পরীক্ষা বড় কঠোর, আমার দায়িত্ব অসীম। পূর্বে আমি প্রত্যেকবার কোন সুস্পষ্ট অন্যায়ের প্রতিমূর্তির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেছি। সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম করেছি। সেই সব সংগ্রামে আমার নিগৃহীত দেশবাসীরা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইহাদের সান্নিধ্য আমাকে অনেক সান্ত্বনা ও শক্তি দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সত্যাগ্রহের রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি সরকারের কোন অবিচারের প্রতিকার করতে যাচ্ছি না। কারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আমি পরীক্ষা করে দেখব আমি সারা-জীবন যে অহিংসার সাধনা করে এসেছি সেই অহিংসা দ্বারা আমি মানুষের মনের অমানুষিকতা দূর করতে পারি কি না। মানুষে মানুষে যে হানাহানি, মানুষে মানুষে যে হিংসা-দ্বেষ, মানুষ হতে মানুষের যে ভয়বিরাগ সেই বিকার মানুষের মন থেকে দূর করতে অহিংসা কতটা কার্যকরী আমার জীবন-সায়াহ্নে তাই যাচাই করে যাব। একাজ বহুতে মিলে করবার নয়। কাজেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা করতে হবে। তাই একাই চলেছি। আমার পাশে শত সহস্র অনুচরের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির উপর আমাকে নির্ভর করতে হবে। তাই আমাকে জনগণের মাঝে অগ্রসর হতে হবে হিংসাদ্বেষ বিমুক্ত অন্তর নিয়ে। আমার মনে কোন কলুষ থাকলে আমার সাধনা ব্যর্থ হবে। তাই

আমি দীনভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার মন থেকে সকল কালিমা দূর করেন, আমাকে যেন শক্তি দান করেন। ইহাই আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কার মুক্ত হয়ে সর্বস্ব দান করতে করতে দীনভাবে নগ্নপদে তীর্থস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থযাত্রীর আদর্শ। তাই আমি আজ নগ্নপদে চলেছি তীর্থ পরিক্রমায়।”

প্রথম পর্য্যায় গান্ধীজী ২রা জানুয়ারী হতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নোয়াখালির ২৯টি পল্লী সর্বসুদ্ধ ১২০ মাইল এবং দ্বিতীয় পর্য্যায় ৫ই ফেব্রুয়ারী হতে ১লা মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ও নোয়াখালির ১৮টি পল্লী ভ্রমণ করেন। দারুণ শীতে পরিণত বয়সে দুর্গম বন্ধুর পল্লীপথে বিপদ সঙ্কুল সংকীর্ণ সেতু পার হয়ে তিনি নগ্নপদে প্রত্যহ একটির পর একটি দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করলেন; গড়ে তিনি ২৫।৩০ মিনিটে এক মাইল পথ অতিক্রম করেন এবং প্রত্যহ গড়ে ২ ঘণ্টা পরিভ্রমণ করেন। বদনে তাঁর কঠোর সংকল্পের দীপ্তি, কণ্ঠে তাঁর মৈত্রী, শান্তি ও নির্ভয়ের বাণী, হৃদয়ে তাঁর অসীম বিশ্বাস, সদা আনন্দময় তিনি। সঙ্গে ছিল মানু গান্ধী,পরশুরাম ও নির্মল বসু, ও সাংবাদিক দল। যেখানে আশ্রয় পেলেন সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করলেন, কখনও হিন্দুর গৃহে কখনও মুসলমানের গৃহে; পথে প্রিয় রামধুন সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশেষতঃ ‘একলা চলরে’ গান গাওয়া হত। এই গানটি তাঁর অন্তরের প্রেরণার উৎস ছিল। পরিক্রমার সময় তাঁর দৈনন্দিন জীবন এইরূপ ছিল: সূর্য্যোদয়ের পূর্বে, কখন কখন রাত্র ২টায় শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য সমাপন, প্রার্থনা, ফলের রস পান, চিঠি-পত্রের উত্তর দান, ডায়েরী লেখা ও চরকা কাটা, ৭॥০ টায় পরবর্তী পল্লীতে নগ্নপদে দীর্ঘ বংশদণ্ডের উপর ভর দিয়ে গমন। ঠাণ্ডায় পথ-ভ্রমণে তাঁর পায়ে নীলা পড়ে যেত। সেজন্য তিনি নূতন গ্রামে পৌছে গরমজলে কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে থাকতেন, তিনি তৎপর আধ ঘণ্টা বাংলা ভাষা শিক্ষা, গ্রাম্য লোকদের অভাব-

অভিযোগ শ্রবণ, বেলা ১১টায় এক ছটাক তরকারি সিদ্ধ ও তিন ছটাক আটা সংযোগে প্রস্তুত একখানি চাপাটি, খানিকটা ছাগলদুধ, তরকারি সিদ্ধ ও একটু গ্লুকোজ আহার, বেলা ১২টায় শরীরে তৈলমর্দন ও স্নান, ডাবের জল পান, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, বেলা ৩টায় মহিলা সভায় বক্তৃতা, সেবক সঙ্ঘের সভায় গঠন মূলক কার্য সম্পর্কে উপদেশ দান, ৫টায় প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান ও বক্তৃতা, আধঘণ্টা সান্ধ্যভ্রমণ, সূর্য্যাস্তের পূর্বে আহার-গ্রহণ, রাত্রি ৮টায় সংবাদপত্র পাঠ ও অধিবাসিদের সঙ্গে আলোচনা, ৯টায় শয্যাগ্রহণ। গান্ধীজীর আপত্তি সত্ত্বেও পল্লীপরিক্রমার সময় গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে একদল সশস্ত্র পুলিশ তাঁর অনুগামী হয়। পরিক্রমার সময় প্রত্যেক গ্রামের হাঙ্গামার বিবরণ ও অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্যাদি সংগ্রহ করা হত। সেজন্য সঙ্গে একটি টিনের বাক্স ও টাইপ রাইটার মেসিন থাকত। এই সময়ে ভারতের সর্বব্যাপারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও ভারতের নানাস্থান ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে প্রত্যহ শত শত চিঠিপত্র তাঁর কাছে আসতে থাকে। নির্মলবাবু এই স্তূপাকার চিঠিপত্র হতে মাত্র খান চল্লিশেক পত্র গান্ধীজীকে দেখাতেন।

অত্যাচারিত মানবের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার জন্য গান্ধীজীর পল্লীক্রমার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কোন আড়ম্বর ছিল না, কোন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল না। কেবল ছিল প্রেম ও অহিংসা দিয়ে মুসলমানদের ও হিন্দুদের হৃদয় জয় করার সংকল্প।

মুসলমানদের মনোভাবঃ—পল্লী-পরিক্রমার সময় গান্ধীজীর অহিংসার পরীক্ষা অনেকটা কৃতকার্য হয়। মুসলমানদের হৃদয় পরিবর্তনে তিনি কতকটা সাফল্য অর্জন করেন। মুসলমানগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করে নাই। তিনি বহু মুসলমান পরিবারের আতিথ্য

গ্রহণ করেন। অনেকের বাড়ীতে তিনি সদলে এক দিন ও এক রাত্র বাস করেন এবং দুএকটি গ্রামে তাদের হাতে ভোজন করেন। মহান অতিথিকে অনেক মুসলমান মহিলা অন্তঃপুরে অভ্যর্থনা করেন। এ ছাড়া তিনি বিনা আমন্ত্রণে পরিক্রমার সময় পথিপার্শ্বে অনেক মুসলমান বাড়ীতে গিয়াছেন, প্রত্যেক বাড়ীতে তিনি অভ্যর্থিত হন। কোথাও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। সর্বত্র তাঁকে তাঁরা পান, ডাব, কমলালেবু পেঁপে, বা ছাগলের দুধ খেতে অনুরোধ করেন। তাঁরা মনে করতেন গান্ধীজী কিছু আহার করলে তাঁদের কল্যাণ হবে। এক স্থলে বাড়ীর স্ত্রীলোকের সঙ্গে গান্ধীজীর একখানি ফটো তোলা হয়। ডাঃ সুশীলা নায়ার ও শ্রীমতী মানু গান্ধী অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তঃপুরে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতেন। দুএক স্থানে সার্বজনীন ভোজেরও আয়োজন হয়। তিনি মেয়েদের পর্দা প্রথা তুলে দিবার ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তাঁর নেতৃত্বে 'বন্দে মাতরম' 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি করা হত। কয়েকস্থানে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হয়। মৌলানাগণ রায়পুরায় গান্ধীজীকে বিখ্যাত জুম্মা মসজিদে অভ্যর্থনা করেন। বিরামপুরে গান্ধীজী এক জেলের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন।

অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন। শিরণ্ডী গ্রামে গান্ধীজীর আশ্রমের শিষ্যা কুমারী আমতুস সালাম হিন্দুর একটি অপহৃত পূজার খড়্গ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনশন করেন। গান্ধীজী ২০শে জানুয়ারী এই গ্রামে পৌছান। সেদিন অনশনের পঞ্চবিংশতি দিবস। গান্ধীজীর উপস্থিতিতে স্থানীয় মুসলমানগণের হিন্দুদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে কুমারী সালাম অনশন ভঙ্গ করেন। এই ব্যাপারে ৫৪টি গ্রামের সাম্প্রদায়িক ঐক্যর ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি তাঁর প্রিয় ভজন

'বৈষ্ণবজন' স্থানে 'ইসাইজন', 'পার্শীজন', 'মুসলিমজন' উচ্চারণ করেন। অনেক স্থলে অযাচিতভাবে মুসলমানরা নিজ হাতে কোদাল, খোন্তা, দা, ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা ও প্রার্থনা-সভার স্থান পরিষ্কার করেছে। গান্ধীজী চণ্ডীপুর প্রার্থনা-সভায় কম মুসলমান দেখে বলেন, "মুসলমানগণ পরীক্ষা করুন আমি সত্যই তাঁদের শত্রু না মিত্র। যদি তাঁরা না আসেন আমি একাই তাঁদের কাছে যাব, তাঁদের পথ-ঘাট সাফ করব, তাঁদের সেবা করব।" এর পর থেকে প্রার্থনা-সভায় মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

আমিষপাড়ার প্রার্থনা-সভায় বার হাজার মুসলমানের ও এক হাজার নারীর সমাবেশ হয়। গান্ধীজীর কোরাণ উদ্ধৃত বাণী সকলে মন দিয়ে শোনেন। একদিন সতীশ বাবুকে কথায় কথায় গান্ধীজী বলেন, "এত দিন যা করেছি আজিকার লক্ষ্যের তুলনায় তা অতি তুচ্ছ মনে হচ্ছে। কি আর করেছি? কতকগুলি লোককে গভর্ণমেণ্টের নিকট ন্যায় আদায় করার জন্য সত্যাগ্রহ করতে শিখিয়েছি। আজিকার প্রয়াসের নিকট সে অতি ছোট জিনিষ।"

অবশ্য অনেক মুসলমান প্রার্থনা-সভায় রামধূন গীত হলে সভা ত্যাগ করেন। অনেকে গান্ধীজীকে বিহারে যেতে উপদেশ দেন। কয়েক স্থানে তাঁর পথে বিষ্ঠা লেপন করে রাখা হয়েছিল, কয়েক স্থানে সেতু ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজীর কার্যের নিন্দা করে অনেকও পোষ্টার আঁটা হয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায় শেষ গ্রাম হাইমচরে গান্ধীজী ছয় দিন অবস্থান করেন। এখানে মিঃ ফজলল হক গান্ধীজীর সঙ্গে ১০ মিনিট আলোচনা করেন।

গ্রাম-সংগঠন—নোয়াখালিতে তিনি এমন আদর্শ পল্লী সমাজ স্থাপনের উপদেশ দেন যাতে পল্লীর প্রত্যেক মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী সরল, স্বচ্ছন্দময়, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দারিদ্র্যহীন হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ জ্ঞানী,

সাহসী, সুরুচি-সম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল হয়, যাতে সমাজে কোন ভেদাভেদ বা জাতিবৈরী না থাকে। সর্বহারা মানুষকে গৃহে পুনঃসংস্থাপনের জন্য নোয়াখালিতে গ্রাম-সংগঠনের কাজ সুরু হয়। গান্ধীজীর প্রেরণায় ও নির্দেশে তাঁর শিষ্যরা বিভিন্ন কেন্দ্রে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু-মুসলমান নিয়ে বিভিন্ন গ্রাম সেবা-সঙ্ঘ গঠিত হয়। রাস্তা নির্মাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, ফিল্‌টারের ব্যবস্থা, টিউব ওয়েল বসাইয়া ও পুষ্করিণীর ধারে ধারে কূপ খনন করিয়া বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ সুরু হয়। গান্ধীজী তাঁতি, কামার, ছুতার, জেলে, দর্জি প্রভৃতি কর্মহীন শিল্পীদের অর্থ সাহায্য করে সমবায় পদ্ধতিতে কারবার চালাইতে উপদেশ দেন। তিনি মিলের সূতার বদলে চরকায় পাকান দো-তার সূতার দ্বারা তাঁতে খদ্দর বুনতে তাঁতিদের উপদেশ দেন। ইহাতে তাঁতিদের মিলের মুখাপেক্ষী হতে হয় না এবং অলস হয়ে বসে থাকতে হয় না! তিনি বিনা খরচায় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি পায়খানার ব্যবস্থা করতে উপদেশ দেন। হাটে যাতে লোকজন ঠেলাঠেসি বা ভীড় না করে শৃঙ্খলার সঙ্গে কেনাবেচা করতে পারে তার ব্যবস্থার উপদেশ দেন। অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য সর্বজাতিকে নিয়ে পংক্তি-ভোজনের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে ধোপা নাপিতরা রন্ধন ও পরিবেশন করে। অনেক ক্ষেত্রে হরিজন দ্বারা স্পর্শ করাইয়া খাদ্যদ্রব্য ভোজন করা হত।

বিহারে গান্ধীজী—নোয়াখালি যাত্রার সময় তিনি বিহারের হত্যাকাণ্ডের বিষয় একটি বিবৃতি দেন : "বিহারবাসীরা তাদের আচরণের দ্বারা আমার মহান ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। বিহারের শতকরা ১৪ জন মুসলমানকে বর্বরের ন্যায় হত্যা করাতে কোন জাতীয়তার চিহ্ন বা সাহসিকতার কিছু নাই। ইহা কাপুরুষতার চেয়ে নিকৃষ্ট। ইহা জাতীয়তা ও ধর্মের কলঙ্ক। বিহারি হিন্দুদের কর্তব্য মুসলমানদের ভাই

এর মত দেখা ,তাঁদের স্বগৃহে ফিরিয়ে আনা ও ক্ষতিপূরণ করা। বিহারের ঘটনার প্রায়শ্চিত্তর জন্য আমি আমার পূর্বেকার স্বল্পাহার বজায় রেখেছি। উন্মত্ত বিহারীদের মতি পরিবর্তন না হলে আমি আমরণ অনশন করব।” এই বিবৃতির পর বিহারের অবস্থা কতকটা শান্ত হয়। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষে পুনরায় অবস্থার অবনতি দেখা যায়। ডাঃ সৈয়দ মামুদ গান্ধীজীকে বিহারে আসার জন্য পত্র ও জরুরী তার পাঠান। গান্ধীজী নোয়াখালির কাজ অসমাপ্ত রেখে বিহারের উন্মত্ততা বন্ধ করার জন্য ৫ই মার্চ পাটনায় ছুটে যান। তিনি ডাঃ সৈয়দ মামুদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর গলার মালা দিতে গেলে তিনি বলেন, “আমি এর জন্য এখানে আসিনি ; আমি বিহারের দুর্ভাগার জন্য অশ্রু বিসর্জন করতে এসেছি।” তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন, মুসলমানদের সাহস দেন, হিন্দুদের ভালবাসা ও প্রেম দিয়ে মুসলমানদের অভিভূত করবার জন্য দুর্গতদের অকাতরে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন এবং দুষ্কৃতকারীদের দোষ স্বীকার করতে উপদেশ দেন। তিনি দুর্গত মুসলমানদের সাহায্যের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি ও সীমান্ত গান্ধী নয় দিন যাবৎ একাদিক্রমে বিধ্বস্ত পল্লী অঞ্চল পরিক্রমণ করেন। পঁচিশ দিন বিহারে অবস্থানের পর গান্ধীজী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে ৩০শে মার্চ্চ নয়াদিল্লী যাত্রা করেন। সঙ্গে সীমান্ত গান্ধীও যান।

তিনি বড়লাটের সঙ্গে পাঁচবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষ করে পুনরায় ১৩ই এপ্রিল পাটনায় ফিরে আসেন। তিনি দিনের পর দিন প্রার্থনা-সভায় শান্তির বাণী প্রচার করেন। অনেক স্থলে শান্তি-কমিটি গঠিত হয়। তাঁর আবেদনে মুসলমানদের মধ্যে আস্থার ভাব ফিরে এল, হিন্দুরা অর্থ ও অলঙ্কার দিয়ে মুসলিম সাহায্য ভাণ্ডার ভরিয়ে দিল, অনেক হিন্দু আত্মাপরাধ স্বীকার করল। ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য পণ্ডিতজীর জরুরী তার পেয়ে তিনি ৩০ শে এপ্রিল পাটনা

ত্যাগ করেন। সেখানে ছ-দিন থেকে বাংলার কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বাংলার সাম্প্রদায়িক অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা চালাবার জন্য কলিকাতায় ছ-দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি ১৫ মে পাটনায় ফিরে যান। তিনি প্রার্থনা-সভায় বলেন, "আমি নোয়াখালি, কলিকাতা বা বিহার যেখানে থাকি না কেন, ফল একই হবে কারণ ভারতের বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সাধনের জন্যই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে কৃত-সংকল্প।" বস্তুতঃ তিনি নোয়াখালি গমনের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মিলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তাঁর আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বিহারের কাজ শেষ করে ২৪শে মে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করতে দিল্লী যান।

ব্রিটিশ মন্ত্রীর ঘোষণা ও ভারত বিভাগ—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে ঘোষণা করেন। বড়লাট ৩রা জুন ঘোষণা করেন যে ১৫ই আগষ্ট ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নামক দুইটি ডোমিনিয়ন গঠিত হবে। গান্ধীজী ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের বাস্তব প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন কিন্তু ভারত বিভাগের প্রস্তাবে খুবই বিচলিত হন। তিনি বললেন, "ভারত বিভাগকে আমি পাপ বলেই মনে করি। হিন্দু মুসলমানকে ধর্মের জন্য পৃথক জাতি বলে মনে করতে পারি না। ভারত বিভাগে ভারতের দুর্গতি সীমাহীন হবে, মানুষ বর্বরতার পর্য্যায়ে নেমে যাবে, ধর্মের দোহাই দিয়ে দরিদ্র শ্রেণীকে আরও পিষ্ট করা হবে, ভারতের স্বাধীনতা হারানর আশঙ্কা থাকবে।" তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে ইংরাজ যাবার সময় ভারত বিভাগ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ জাতির দেহে ছড়িয়ে দিয়ে গেল যাতে সমস্ত দেশ অগ্নিকুণ্ডে জ্বলেপুড়ে মরে। স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের

চেয়ে স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব গুরুতর।" তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হল। হিংসায় উন্মত্ত ভারতে ইন্ধন যোগাল ইংরেজ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বন্ধ করবার জন্য ভারত বিভাগ মেনে নিল কিন্তু ভারত বিভাগ হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আরও বেড়ে গেল। ভারতের কোথাও না কোথা বিশেষতঃ পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ, বোম্বাইতে হানহানি লেগেই থাকল। সাম্প্রদায়িক বিষে ভারতের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠল।

এশিয়া মহাসম্মলনে গান্ধীজী—গান্ধীজী ১লা এপ্রিল এশিয়া মহা-সম্মেলনে সারগর্ভ বক্তৃতায় অখণ্ড বিশ্ব-গঠনের জন্য এশিয়াবাসীকে আহ্বান করেন। তিনি বাণী দেন, "বন্ধুগণ, আপনারা ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ দেখেন নি এবং আপনাদের সভা প্রকৃত আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। গ্রামে ভাঙ্গীদের কুটিরে ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপ দেখতে পাবেন। আপনাদের অনেক আবর্জনা-স্তূপ সরিয়ে গ্রামের ভিতরের বস্তুকে দেখতে হবে। বর্তমান গ্রামগুলি আবর্জনা-স্তূপ। আমি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে দেখেছি মনুষ্যত্বের অসহনীয় রূপ, দেখেছি মানুষের দীপ্তিহীন চোখ। এই সকল মানুষ নিয়ে ভারতবর্ষ। ......পূর্ব দেশ হতে পশ্চিম দেশ জ্ঞানের আলোক লাভ করেছে। জোরোয়াষ্টার, মহম্মদ, বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণ সবাই পূর্ব দেশের মহাপুরুষ। ......আপনারা পশ্চিম দেশকে সত্য ও প্রেমের বাণী দিবেন। ...... আপনারা শোষিত হয়েছেন বলে প্রতিহিংসার দ্বারা পশ্চিম দেশ জয় করবেন না। ...পশ্চিম দেশ আজ জ্ঞানের তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠেছে। আণবিক বোমার ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে পশ্চিম হতাশ হয়ে পড়েছে। পশ্চিম বুঝেছে আণবিক বোমায় সারা বিশ্ব ধ্বংস হবে। বাইবেলের প্লাবন বোধ হয় আগত প্রায়। আপনাদের কাজ বিশ্বকে পাপের ও শঠতার কথা জানিয়ে দেওয়া।"

গান্ধীজীর শেষ চেষ্টা—৫ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা কল্পে গান্ধীজী ২৪ ঘণ্টা অনশন করেন। বড়লাটের উদ্যোগে গান্ধীজী ও মিঃ জিন্না হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা কোরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বন্ধের জন্য ১৫ই এপ্রিল এক যুক্ত আবেদন প্রচার করেন। ৬ই মে নয়াদিল্লীতে গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হয়। মিঃ জিন্না বললেন, "ভারত বিভাগই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।" গান্ধীজী বললেন, "ভারত বিভাগ অনিবার্য বলে মনে হয় না।" আগষ্ট মাসের প্রথমে তিনি কাশ্মীরে যান। সেখানে তখন মহারাজার শাসনকার্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে কাশ্মীরবাসিদের ইচ্ছানুসারে কাশ্মীর ও জম্মুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হওয়া উচিৎ। এই সময়ে কলিকাতায় পুনরায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সুরু হয়। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে কলিকাতায় ছুটে এলেন। বেলিয়াঘাটায় দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে এক মুসলমানের বাটিতে অবস্থান কোরে তিনি শান্তিরকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর জীবনে এই সময়ে কোন কারণে এক পরিবর্তন আসে। তিনি গান্ধীজীর শান্তি-মিশনে যোগদান কোরে বেলিয়াঘাটা বাড়ীতে গান্ধীজীর সঙ্গে অবস্থান করেন। এখানে এক উশৃঙ্খল জনতা এক রাত্রিতে গান্ধীজীকে অপমান করে। তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এসে তাঁর আশ্রয়-দাত্রী আপ্পা সাহেবা অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে আর্তত্রাণে-আত্মনিয়োগ করেন। অকস্মাৎ ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে, ঠিক এক বৎসর পরে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে গান্ধীজীর শান্তি-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। স্বাধীনতা দিবসে সমস্ত দেশময় আনন্দোৎসব চলল কিন্তু গান্ধীজী সমস্ত দিন অনশনে ও প্রর্থনায় কাটালেন। এই সময় পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে ভীষণ দাঙ্গা সুরু হয়, যার ফলে শত শত হিন্দু-মুসলমান নিহত হয়,

লক্ষ লক্ষ লোক নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগী হয়। পাঞ্জাব থেকে তাঁর ডাক এল। কিন্তু অকস্মাৎ ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আবার দাঙ্গা সুরু হয়। গান্ধীজী খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। তবে কি এই শান্তি একটা, ধাপ্পাবাজী ? কোন ভরসা না পেয়ে সেই দিনপ্রাতে গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন এবং যত দিন শান্তি ফিরে না আসে ততদিন অনশন ভঙ্গ করবেন না প্রতিজ্ঞা করেন। এই দাঙ্গায় শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে প্রাণ দিলেন বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী শচীন্দ্র মিত্র, স্মৃতিশ ব্যানার্জি। ৪ ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পূর্ণ শান্তি বিরাজিত হওয়ায় এবং শান্তি রক্ষার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করায় ঐ দিন রাত্র ৯ টার সময় তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলিকাতায় শান্তিবাহিনী গঠিত হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি শেষবারের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করে দিল্লী যাত্রা করেন। দিল্লীতে তখন দাঙ্গা চলছে।

শেষ অনশন—এক বৎসর যাবৎ গান্ধীজী সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা স্বত্ত্বেও কোনই সুফল উদ্ভব হল না। অর্ধ শতাব্দী যাবৎ বহু ত্যাগীর সাধনা-লব্ধ স্বাধীনতা বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি দিল্লীর দাঙ্গা-প্রতিরোধের জন্য করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে শপথ গ্রহণ করলেন তবুও দাঙ্গা থামল না। ১০ই সেপ্টেম্বর বললেন, "চারিদিকে ঘন তমসা। এই ভাবে ভ্রাতৃনিধন যজ্ঞ যদি চলে তবে তা দেখবার জন্য আমার বেঁচে থাকবার সাধ নেই। তার চেয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেন। এইভাবে ভারত ও পাকিস্থান বিবাদ করলে উভয়ই ধ্বংস হবে।" অদৃষ্ট দেবতা বোধ হয় তাঁর প্রার্থনা শুনতে পেলেন। এত দিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল; অক্টোবরে কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হল। করাচিতে দাঙ্গা

সুরু হল। ৮ই জানুয়ারী তিনি জানালেন, "ভারত শান্ত হলে আমি পাকিস্থানে যাব।" সাম্প্রদায়িক বিবাদে তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হল। তিনি অনন্যোপায় হয়ে ১৩ই জানুয়ারী অনশন আরম্ভ করেন।

শেষ আবেদন—কংগ্রেসের দুর্নীতির ও সাম্প্রদায়িক বিবাদের কথা তিনি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বলেন, "অহিংসার উপাসককে অনেক সময় সমাজের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে অনন্যোপায় হয়ে অনশন অবলম্বন করতে হয়। এইরূপ অবস্থাতেই আমি পতিত হয়েছি। আনন্দমুখর দিল্লী মৃতের নগরীতে পরিণত হয়েছে। আমাকে দিল্লীতে থাকতেই হবে এবং শান্তি প্রচেষ্টায় জীবনপণ করতে হবে।......একমাত্র মন্ত্রের সাধনই আমাকে আমার অতুলনীয় বান্ধব মৃত্যু হতে দূরে রাখতে পারে। হিন্দু মুসলমান ও শিখের বন্ধুত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। স্বদেশ হিতৈষী কোন ভারতীয়ই এই অবস্থা মেনে নিতে পারে না। আমার অন্তরের আহ্বান দুর্বলতারূপ শয়তানের আহ্বান কিনা এ-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য আমি এতদিন উহার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। আমি কখনই নিজেকে অসহায় মনে করতে চাহি না। একজন সত্যাগ্রহীর ঐরূপ মনে করা উচিত নয়—তরবারির স্থলে অনশনই তাঁর শেষ অবলম্বন।

"সম্প্রতি আমি অন্তরে একটা দুর্বলতা অনুভব করছিলাম। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরে আমি সুখী হয়েছি। যদি কোন ব্যক্তি সাধু হন, তবে তাঁর জীবনদান অপেক্ষা মূল্যবান জিনিষ আর কিছুই থাকে না। আমার অন্তর যেন পবিত্র থাকে এই প্রার্থনাই আমি করছি। আমি যখন বুঝিতে পারব যে, বাহিরের চাপ ব্যতীত অন্তরের জাগ্রত কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের অন্তরের মিলন ঘটেছে, তখনই আমি অনশন ত্যাগ করব।

"আমার বন্ধুরা এবং আমার যদি কোন শত্রু থাকে তবে তাঁরা

যেন আমার উপর ক্রোধান্বিত না হন। ঈশ্বরই আমার একমাত্র উপদেষ্টা। আমি যদি ভুল করি এবং তা যদি আবিষ্কার করতে পারি, তবে উচ্চকণ্ঠে তা স্বীকার করতে আমি ইতঃস্তত করব না। ভুল পথ হতে সরে আসতেও আমি দ্বিধা করব না। কিন্তু এইরূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনা খুব কম। কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করলে যেমন তার পুরস্কার আছে, তেমনি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনশনেরও পুরস্কার আছে। অনশন করলে ফল পাওয়া যাবে বলে আমি ইহা করছি না। আমার অনশন করা উচিত বলেই আমি অনশন করছি। সেই জন্য আমি সকলকে নিরপেক্ষভাবে আমার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করতে এবং আমায় যদি মৃত্যুবরণ করতে হয়, তবে শান্তিতে আমায় মৃত্যুবরণ করতে দিবার জন্য অনুরোধ করছি। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম, শিখধর্ম ও মুসলমান ধর্মের ধ্বংস দেখা অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে মুক্তির সামিল হবে। পাকিস্থান যদি বিভিন্ন ধর্মের লোকের জীবন ও সম্পত্তিকে রক্ষা না করে এবং সকল ধর্মের লোকদের সমান মর্যাদা না দেয় এবং ভারতবর্ষ যদি পাকিস্থানের পন্থা অনুসরণ করে তবে ধ্বংস অনিবার্য।

"ভারতের কি শোচনীয় দুর্দশা ঘটেছে তাহা একবার ভেবে দেখুন। এই অবস্থায়ও ভারতের এক দীন সন্তান এই যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের মত শক্তি ও পবিত্রতার অধিকারী—ইহা চিন্তা করে আপনারা আনন্দ পাবেন। কিন্তু ভারতের কোন বীরই যদি সে অধিকারী না হয় তা হলে যত শীঘ্র সে ভারত-পৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করে ততই মঙ্গল।

"ভগবানের উপর আমার নির্ভর। বন্ধুগণকে আমি আত্মানুসন্ধানেই মনোনিবেশ করতে অনুরোধ করেছি। অনশন আত্মশুদ্ধিরই প্রক্রিয়া বিশেষ।

"অন্ধ্র হতে একখানি পত্র এসেছে। তাতে বলা হয়েছে যে

কংগ্রেসীদের মধ্যে ঘোরতর নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা লোলুপতা উহাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে; সকলেরই নিজ নিজ সুবিধা করে নিবার দিকে মন। ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ কোরে এমন কি ফৌজদারী আদালতের বিচারকার্য্যে বাধাদান কোরে অর্থার্জনের চেষ্টাও হয়। পরিষদের সদস্যগণ তাঁদের দলের লোকদের জন্য প্রায়ই অন্যের কার্যে হস্তক্ষেপ করায় কালেক্টর ও রাজস্ব বিভাগেব কর্মচারী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। সৎ কর্মচারীরা নিজেদের পদে বাহাল থাকতে পারেন না, কারণ তাঁদের নামে মন্ত্রীদের নিকট মিথ্যা রিপোর্ট প্রদত্ত হয়। মন্ত্রিগণ এই সকল স্বার্থান্বেষীদের কথা সহজেই বিশ্বাস করেন। আমার সহিত যাঁরা একমত নহেন, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব। আমার অনশনে লোকের বিবেক বুদ্ধি যেন দ্রুত জাগ্রত হয়। ইহাতে যেন লোকের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট না হয়।

"কংগ্রেস মহলে দলাদলি, কতিপয় পরিষদ সদস্যের অর্থার্জ্জনের জন্য তৎপরতা এবং মন্ত্রীদের দুর্বলতার জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি করছে। জনসাধারণ এখন বলতে আরম্ভ করেছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনেক ভাল ছিল; এমন কি জনসাধারণ এখন কংগ্রেসকে অভিশাপ দিচ্ছে। এ থেকে আমরা যেন সকলে সতর্ক হই।"

গান্ধী-বিদ্বেষ—এক শ্রেণীর হিন্দুর মনে ধারণা জন্মেছিল যে গান্ধীজী মুসলমানদের তোষণ-নীতি অবলম্বন করে হিন্দুদের অশেষ ক্ষতিসাধন করছেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য দোষী হলেও তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দুদের ও গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে মুসলমানদের নিরাপত্তার সর্ত ও প্রতিশ্রুতি আদায় করছেন অথচ পাকিস্থানে মুসলমানদের বা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে হিন্দুদের নিরপত্তার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করেন নি। এই শ্রেণীর হিন্দুরা এত ক্ষিপ্ত হন

যে তাঁরা গান্ধীজীর জীবন-নাশের চেষ্টা করেন। অনশন ভঙ্গের পর থেকে তাঁর জীবন-নাশের ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায় কিন্তু তিনি কোনরূপ পুলিশ সাহায্য গ্রহণে আপত্তি করেন। ২০শে জানুয়ারী দিল্লীর প্রার্থনা-সভায় তাঁর কাছ থেকে ১৫ গজ দূরে একটি দেশী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ী সাধক সেবার বেঁচে যান। ২৯শে একদল হিন্দু শরণার্থী তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বলে, "আপনাকে আমাদের জন্য আর ভাবতে হবে না, আপনি হিমালয়ে প্রস্থান করুন।"

মহাপ্রয়াণে গান্ধীজী

অশুভ শুক্রবার—মৃত্যুর পূর্বদিনে ২৯শে জানুয়ারী গান্ধীজী এত কর্ম ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে বললেন, "আমার মাথা ঘুরছে কিন্তু তাহলে কি হবে আমাকে এটা (কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাব) শেষে করতেই হবে। আমাকে বোধ হয় রাত জাগতে হবে।" রাত্র ৯-১৫ মিনিটে শুতে যাবার সময় তাঁকে ব্যায়াম করার কথা মনে করে দেয়াতে তিনি ব্যায়ামাগারে সামান্য একটু ব্যায়াম করলেন। বিছানা গ্রহণ করে তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মালিশ করালেন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর প্রত্যহ এই সময় তিনি শান্ত ও সৌম্য পরিবেশের মধ্যে হালকা আলাপ ও রসিকতার ভিতর দিয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। আশ্রমবাসী একজন অসুস্থ মহিলাকে তিনি তিরস্কার কোরে বললেন, "যদি রামধূন তোমার অন্তর্লোকে থাকে তবে তো তোমার অসুখ হতে পারে না। কিন্তু তাতেও প্রয়োজন বিশ্বাসের।" কথা বলতে বলতে তিনি কিছুক্ষণ হঠাৎ কেমন যেন একটু আনমনা হয়ে ধীরে ধীরে একটি কবিতার দুটি চরণ আবৃত্তি করলেন, "অদ্ভুত এই

পৃথিবী! আর কত কাল খেলব এই খেলা।" তখন কে জানত যে পৃথিবীর খেলা তাঁর শেষ হয়ে এসেছে।

সে সময় তিনি 'ভ্রমণের লাঠি' সম্পর্কে বলেন, "আমি ভ্রমণের সময় বালিকাদের কাঁধে হাত দিয়ে চলি। আমার কাছে এটা খুব ভাল লাগে কিন্তু আসল কথা আমি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাসক্ত।"

সেই অশুভ শুক্রবার এল যে শুক্রবারে উনিশ শত আটচল্লিশ বৎসর পূর্বে অহিংসার ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক যীশুখৃষ্ট ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন। গান্ধীজী চির অভ্যাসমত শেষ রাত্রি ৩-৩০ মিনিটে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন কোরে করযোড়ে প্রার্থনা করলেন এবং ঐক্যতানে প্রিয় রামধূন গীত গাইলেন। তারপর তিনি চারপায়ার উপর বসে পার্শ্বচর বিষাণকে বললেন, "আজ সব জরুরী চিঠিগুলি আমাকে দেবে। সারাদিন সেগুলোর কাজ শেষ করব।" তিনি খুব ক্লান্ত ছিলেন। তিনি কাজ আরম্ভ করে সামান্য একটু ঘুমিয়ে নিলেন। ৮টার সময় তিনি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাব পিয়ারীলালকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে বলেন। ইহাই জাতির প্রতি তাঁর শেষ দলিল ও ইচ্ছাপত্র। তৎপর তিনি পিয়ারীলালকে নোয়াখালির অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দিয়ে মাদ্রাজের আসন্ন খাদ্য-সংকট সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে বলেন। তিনি বলেন, "মাদ্রাজ প্রকৃতির আশীর্বাদে পুষ্ট, মাদ্রাজে প্রচুর নারকেল, তাল, বাদাম ও কলা আছে আরও কত রকমের ফলমূল রয়েছে। এই সম্পদকে কি করে কাজে লাগাতে হয় তাঁরা যদি তা জানে তবে তাদের কখনই অনশনে থাকতে হবে না।" স্নানের পর তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। পূর্ব রাত্রের পরিশ্রমের সব গ্লানি দূর হয়েছিল। তিনি দৈনন্দিন বাংলা লেখা শেষ কোরে বেলা ৯-৩০টার সময় ছাগলের দুধ, রান্না ও কাচা তরকারী, কমলালেবু, আদা, টকলেবু, ও ঘৃতকুমারী আহার করলেন।

তিনি তারপর পিয়ারীলালকে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের কিছু পরিবর্তন করতে বললেন। পিয়ারীলাল ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট তাঁর কাছে পেশ করলেন। পিয়ারীলাল ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে উত্থাপিত নোয়াখালি হতে লোকাপসারণের কথা বললেন। তিনি লোকাপসারণের বিরুদ্ধে মত দেন। সমস্ত দিন বিরামহীন সাক্ষাৎকার চলল। মধ্যাহ্নে তন্দ্রার পর শ্রীসুধীর ঘোষ ও দিল্লীর মৌলানারা এলেন। মৌলানাদের তিনি বললেন, "ভগবান অন্য ব্যবস্থা না করেন ত আমি ওয়ার্ধায় যাব, তবে অদৃশ্য কিছু তো হতে পারে।" প্রশ্নোত্তরে আমেরিকার সংবাদ-দাতা মার্গারেটকে তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, "পৃথিবীতে যে সব ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটছে সেজন্য আমি ১২৫ বৎসর বাঁচবার আশা ত্যাগ করেছি। আমি অন্ধকারে বাঁচতে চাই না। তবে আমার সেবার প্রয়োজন হলে ও প্রত্যাদেশ পেলে আমি ১২৫ বৎসর বাঁচব।" বেলা ৪-৩০ টায় তিনি রাত্রের আহার করেন। এই তাঁর শেষ আহার।

মহাপ্রস্থান—মন্ত্রী-সভার ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টার সম্বন্ধে সদার প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনা হয়। প্রার্থনা-সভার সময় হয়ে গিয়েছে দেখে আভা গান্ধী তাঁর সম্মুখে ঘড়িটি রেখে দিল। তিনি তখন উঠে পড়লেন। প্রার্থনা-সভায় শ'পাঁচেক নরনারী তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃত বাণী শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। তিনি ৫টা ৫মিনিটের সময় তাঁর 'ভ্রমণের যষ্ঠি' নাতবৌ ও নাতনি আভা ও মানু গান্ধীর কাঁধে হাত দিয়ে বিড়লা ভবন থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদক্ষেপে প্রার্থনা বেদীর দিকে অগ্রসর হলেন। চঞ্চল জনতা তাঁর দর্শন পেয়ে 'গান্ধীজী কি জয়' বলে অভ্যর্থনা করল এবং তাঁরা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে তাঁর জন্য পথ করে দিল। বেদীর সিঁড়ির কাছাকাছি

গিয়েছেন এমন সময় জনতার মধ্য থেকে একজন বললে, "বাপুজী, আজ আপনার একটু দেরী হয়েছে।" গান্ধীজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট হাসি একটু হাসলেন। সহসা সেই মুহূর্তে ভারতের অদৃষ্টাকাশে ভীষণ বজ্রপাত হল। ভীড় ঠেলে সামরিক পোষাক পরিহিত একটি যুবক গান্ধীজীর পশ্চাৎ থেকে তাঁর সামনে এসে একটু হেঁট হল। সকলে ভাবলে যুবকটি গান্ধীজীর পদধূলি নিতে চায়। মানু গান্ধী তাড়াতাড়ি যুবকটিকে বাধা দিতে গেলেন। সে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিল। অকস্মাৎ সে একটি রিভলবার বার কোরে মাত্র দুগজ দূর হতে গান্ধীজীর প্রতি পরপর তিনবার গুলি ছুড়ল। প্রথমটি তাঁর পেটে বিদ্ধ হওয়ার পরও তাঁকে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। "হা রাম হা রাম" অর্ধস্ফুট কণ্ঠে শেষ চারটা কথা উচ্চারণ করলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি পেটে ও বুকে লাগবার পর তিনি ঢলে পড়লেন। ঘটনাটি এত অকস্মাৎ হল যে কেউ বুঝতে পারল না যে কি ঘটল। তাঁর চশমা ছিটকে পড়ল, চপ্পল কোথায় হারিয়ে গেল। সকলেই হতভম্ব হয়ে গেল। আতঙ্কিত জনতা ছুটাছুটি করতে লাগল। গান্ধীজীর ক্ষতস্থান দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্তক্ষরণে শুভ্র খদ্দর রঞ্জিত হল। অহিংসার সাধক হিংসার বহ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এক মুহূর্তে বিশ্বের এক অপূরণীয় বিরাট ক্ষতি সাধন হয়ে গেল! আততায়ী গুলির দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা করল কিন্তু তৎপূর্বে জনতা তাকে ধরে ফেলল, পরে তাকে পুলিশের হেপাজতে দেওয়া হয়। এদিকে আভা ও মানু গান্ধীজীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তাঁকে বিড়লা ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি সংগাহীন হয়ে যান। তাঁর চক্ষু নিমীলিত, মস্তক অবনত, মুখমণ্ডল প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও হাস্যময় ছিল। বুকের উপর যুক্তকরে যেন আততায়ীকে ক্ষমা করছেন। এ কল্পনাতীত দুঃসংবাদ দাবানলের মত দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল। অফুরন্ত ব্যাকুল

জনস্রোত বিড়লা ভবনের সামনে হাজির হতে লাগল। ছুটে এলেন নেহেরু ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ। সকলের মুখে কাতর প্রার্থনা "বাপুজীকে বাঁচাও ভগবান!" সকলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, একি হল! জনতা অধীর উৎকণ্ঠায় মুহুর্মুহু জিজ্ঞাসা করে, "কেমন আছেন বাপুজী!" ডাক্তারও এল কিন্তু সকল চেষ্টা, সকল প্রার্থনা ব্যর্থ হল। ৫টা ৪০ মিনিটের সময় দেওয়ান চমনলাল দরজার সামনে দাঁড়ালেন। মুখ তাঁর বিবর্ণ, চোখ তাঁর অশ্রুপূর্ণ। তিনি কম্পিত ক্রন্দন-বিজড়িত কণ্ঠে জানালেন "বাপুজী, ইহজগতে আর নাই!" আণবিক শক্তির গতিতে এই দুঃসংবাদ সহরময় ছড়িয়ে পড়ল। বড়লাট ও জামসাহেব, বিভিন্ন দেশের রাজদূত, নেতৃবর্গ ছুটে এলেন বিড়লা ভবনে। দোকানপাট, রেঁস্তোরা, সিনেমা, সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। বিয়ের মিছিল ভেঙ্গে গেল। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হল। জাতির পিতার বিয়োগে সকলেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। জনতার আকুল আহ্বানে খদ্দর আচ্ছাদিত তাঁর পবিত্র দেহকে অলিন্দে স্থাপন করা হল। শেষবারের মত জনতা তাঁর সদাহাস্যময় মুখখানি দেখল। দিল্লীর বেতার প্রচারক করুণ কণ্ঠে মুহুর্মুহু ঘোষণা করছেন "বাপুজী আর নেই"। সমস্ত প্রোগ্রাম বন্ধ হল। তারে-বেতারে পৃথিবীর সর্বত্র এ খবর পৌছাল। সর্বত্রই জনতা স্তম্ভিত ও হতবাক। বিশ্বের একি দুর্দিন!

শোকযাত্রা—গান্ধীজীর পূর্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর মৃতদেহকে পচন-নিবারক ঔষধ দিয়ে রক্ষা করার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। রাত বারটায় শব পবিত্র যমুনার জলে স্নান করিয়ে তাতে চন্দন ও কুঙ্কুম লিপ্ত করা হয়, একটি জাতীয় পতাকা শবের উপরে রাখা হয় এবং খদ্দরের মালা গলায় পরাণ হয়। শবাধার গোলাপের স্তবকে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। কক্ষটি ফুলের পাঁপড়িতে সমাকীর্ণ হয়ে যায়। সমস্ত রাত মৌলানা

আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহেরু ও গান্ধীজীর আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি শবের চারিপাশে বসে গীতা, কোরাণ, ভজন, রবীন্দ্র-সঙ্গীত আবৃত্তি করেন। বহুলোক সমস্ত রাত্রি রাস্তায় অপেক্ষা করে।

শনিবার সকাল হতে অগণিত নরনারী এসে হাজির হল বিড়লা ভবনের সামনে। বেলা পৌণে বারটার সময় মানু গান্ধী, পিয়ারীলাল ও অন্য কয়েকজন ভক্ত ধীরে ধীরে শবটি একটি পুষ্প সজ্জিত সামরিক যানে তুলে দেন। শবযানে বসেন সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহেরু, দেবদাস গান্ধী, রামদাসগান্ধী, ও সর্দার বলদেব সিংহ। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সৈন্যগণ যানটি টেনে নিয়ে যায়। শোকযাত্রার সঙ্গে ছিল বড়লাটের দেহরক্ষী সৈন্যগণ, রাজদূত, নেতৃবর্গ, লক্ষ লক্ষ নরনারী। ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান-শিখ, আবাল-বৃদ্ধ সকলের এক জনসমুদ্র চলেছে নগ্নপদে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায় দিতে। গাছের ডালে, বাড়ীর ছাদে, পথে-ঘাটে লোকারণ্য। চারিদিকে কেবল শঙ্খধ্বনি, রামধুন ভজন, গীত ও 'গান্ধীজী কি জয়' শোনা গেল। শবযানটি ফুলে ফুলে, মালায় মালায় ছেয়ে গেল। দিল্লীর গেটের কাছে তিনটি বিমান থেকে শবাধারের উপর পুষ্পবৃষ্টি হয়। বেলা ৪টা ২০ মিনিটে শোকযাত্রা সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে যমুনা তীরে রাজঘাটে পৌছায়।

চিতাশয্যা—তিন ফুট উচ্চ, বার ফুট দীর্ঘ ও বার ফুট প্রশস্থ একটি চিতা পূর্ব হতে সজ্জিত ছিল। শব দাহের জন্য পনের মণ চন্দন কাঠ, চার মণ ঘি, দু মণ গন্ধদ্রব্য, এক মণ নারকেল, পনের সের কর্পূর রাখা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করবার জন্য বিশেষ বিমানযোগে বড়লাট-পত্নী (মাদ্রাজ হতে), বাংলার, মাদ্রাজের, যুক্ত প্রদেশের ও পূর্ব পাঞ্জাবের গভর্ণর এবং অনেক নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে পৌছান। রাজঘাটে বিরাট জনতা শেষ দর্শনের জন্য পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে শবের দিকে ছুটে যায়। ভীড়ের

চাপে বহু শিশু ও নারী অচৈতন্য হয়। বেলা ৪॥ টায় আশ্রমবাসীরা শবটি চিতা-শয্যায় স্থাপন করেন। চীন দেশের রাষ্ট্রদূত নগ্নপদে শবের উপর প্রথম ফুলের মালা স্থাপন করেন। ৪টা ৫৫ মিনিটে পণ্ডিত রামধন শর্মা কর্তৃক বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রামদাস গান্ধী (গান্ধীজীর তৃতীয় পুত্র) শবকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া ঘৃত মাখান এবং মুখাগ্নি করেন। চিতার লেলিহান শিখায় ক্রমে ক্রমে আকাশ রক্তিম হয়ে উঠল। চন্দন ও ধূপের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে ও বিষণ্ণ মুখে বড়লাট, তদীয় পত্নী ও কন্যাদ্বয় এবং নেতৃবৃন্দ ও জনতা নিষ্পলক দৃষ্টিতে এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখতে লাগলেন। চিতার আলো ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। সন্ধ্যা ছয়টায় অবিনশ্বর মহামানবের নশ্বর দেহ ভস্ম হয়ে গেল। ভারতের অন্যত্র লক্ষ লক্ষ লোক নদীতীরে বা সমুদ্রতীরে ঐ সময়ে স্মৃতি তর্পণ করেন। মৃত্যুর দিন ও পরদিন বহু লোক যেন পিতৃ বিয়োগের জন্য অনশন করেন। বহু লোক চন্দন কাষ্ঠের টুকরা, পদদলিত ফুলের পাঁপড়ি, চিতাভস্ম, রক্তরঞ্জিত মাটি সংগ্রহ কোরে তার পুণ্যস্মৃতি রূপে রক্ষা করেন। গান্ধীজীর কক্ষে তাঁর ব্যবহৃত মাদুর, বই, কাগজপত্র, যারবেদা চরকা, ব্রহ্ম দেশীয় কৃষকের টুপি (উপহার) ও ধূপদানী পড়ে ছিল।

পুতাস্থি ও চিতাভস্ম বিসর্জন—১২ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৯॥টায় বিশেষ ট্রেণের বিশেষ কামরায় কাষ্ঠাসনে স্থাপিত এক শিবিকায় তাঁর পুতাস্থি ও চিতাভস্ম দিল্লী হতে এলাহাবাদে আনা হয়। সেখানে অগণিত লোক ও পাঁচশত নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধাবনত মস্তকে পুতাস্থি অভ্যর্থনা করে। তাম্র নির্মিত ভস্মাধারটি নেতৃবৃন্দ একখানি পতাকা সজ্জিত ট্রেলারের উপর স্থাপন করেন। ট্রেলারটি ১৭ ফুট উচ্চ একটি সুসজ্জিত বেদীর উপর স্থাপন করেন। বিচ্ছুরিত আলোক ছটা সহ গান্ধীজীর একটি মূর্তি ভস্মাধারের পাশে

স্থাপিত হয়। যাত্রাপথে বিমান হতে পুষ্পবৃষ্টি হয়। সৈন্য দল শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকে। প্রত্যেক দু মিনিট অন্তর একটি কোরে গান্ধীজীর বয়সের স্মারক হিসাবে মোট ৭৯টি তোপ-ধ্বনি হয়। ত্রিবেণী সঙ্গমে শোভাযাত্রা পৌঁছিলে বৈদিক অনুষ্ঠান মত রামদাস গান্ধী গান্ধীজীর শ্রাদ্ধ করেন। আধ ঘণ্টা ভস্মাধারটি নৌকাযোগে নদীবক্ষে চলবার পর রামদাস গান্ধী দুগ্ধমিশ্রিত ভস্ম সঙ্গমে বিসর্জন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গঙ্গাতীরে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক সমবেত হয়। ঠিক এই সময়ে হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত প্রায় এক শত জায়গায় বিভিন্ন নদীতে চিতাভস্ম বিসর্জন হয় এবং বৈদিক প্রথানুযায়ী তর্পণ হয়। শত শত মসজিদে, গির্জায় ও মন্দিরে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যবিতে স্যার ক্রিপস্ তাঁর স্মৃতি তর্পণ করেন। দিল্লীর জুম্মা মসজিদে তাঁর ভস্ম প্রোথিত হয়।

পৃথিবীব্যাপী শোক-প্রকাশ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ১৩ দিন রাষ্ট্রিয় শোক পালন করে এবং জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখে। গান্ধীজীর হত্যার নিদারুণ সংবাদে একজন মুসলমান পিওন, একজন পুস্তক বিক্রেতা, একজন শ্রমিক, একজন মহিলা কর্মি ও আরও তিনজন লোক হৃদযন্ত্র বন্ধ হওয়ায় মারা যায়। গান্ধীজীর তিনজন শিষ্য তাঁকে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন করেন। দু জন অনশন ভঙ্গের সময় মারা যান। এই সংবাদে দু জন ইংরাজ ও একজন মার্কিণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। একজন বলেন, "আমার পিতার মৃত্যুতেও এত বিচলিত হই নাই।" ভারতে ও পাকিস্থানে শনিবার সমস্ত কাজকর্ম দোকানপাট বন্ধ থাকে। শুক্রবারে লণ্ডনে সংবাদ পৌঁছান মাত্র ষ্টক একচেঞ্জ বন্ধ হয়, কাগজের বিশেষ বিশেষ সংস্করণ বেরোতে বেরোতে ফুরিয়ে যায়। টেলেতে মৃত্যু-সংবাদ এটে দেয়া হয়। লণ্ডনের আন্তর্জাতিক ভাষা পরিষদে ষোলটি দেশের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে জাতিপুঞ্জের পতাকা তিন দিন অর্ধনমিত থাকে এবং অধিবেশন তিন দিন বন্ধ থাকে।

ভারতের এমন সহর বা পল্লী নাই যেখানে তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিড়লা ভবনের যে স্থানে গান্ধীজী নিহত হন সেই স্থানে একটি চতুষ্কোণ বেদী নির্মিত হয়েছে। বেদীর উপর ঘটনার তারিখ ও সময় ৩০শে জানুয়ারী ৫-১৭ মিনিট এবং 'হা রাম হা রাম' খোদাই করা হয়েছে।

বিশ্বের শ্রদ্ধাঞ্জলি—ভারতের ও পাকিস্থানের প্রত্যেক নেতা, পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সব দেশের রাজা, সম্রাট বা প্রেসিডেণ্ট, বড় বড় নেতা গান্ধীজীর মৃত্যুতে শোক-বার্তা প্রেরণ করেন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর গুণাবলীর সমালোচনা করা হয়। নিম্নে সংক্ষেপে কয়েকটি বৈদেশিক বার্তা দেওয়া হল। এই সকল শোক বার্তায় দেখা যায় তিনি শুধু ভারতের ছিলেন না, তিনি সমগ্র বিশ্বের ছিলেন।

বার্ণাডশ—অতি ভাল হবার বিপদ যে কত এতেই বোঝা যায়। **ইংলণ্ডের রাজা**—মর্মাহত হয়েছি, পৃথিবীর মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হল। **প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান**—তাঁর জীবন ও কর্মধারা অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে। তাঁর আদর্শ ও কার্যাবলী বিশ্ববাসীর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। আমরা তাঁর বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব থেকে প্রেরণা লাভ করব। **মিঃ এট্‌লি**—স্তম্ভিত হয়েছি। গান্ধীজী বর্তমানে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তবে তিনি যে যুগের মানব সে যুগ পৃথিবীতে আদৌ আসবে কি না কে জানে। তাঁর আত্মা সমস্ত বিশ্ববাসীকে শান্তি ও সম্প্রীতির পথে পরিচালিত করবে এই আমার দৃঢ় অভিমত। **পার্ল বাক**—সকল বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানবের তিরোধানে শোকাভিভূত। তাঁর আদর্শ কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব ভারতকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সম্মান এখন শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছে। **প্রেসিডেণ্ট কাইসেক**—অহিংসা

মন্ত্রের ঋষিকে যে হিংসার আগুনে আত্মাহুতি দিতে হল এর চেয়ে হৃদয়-বিদারক আর কি হতে পারে? **সম্রাট হিরোহিটো**—এ যুগের সব চেয়ে মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটল। **রাজা ফারুক**—প্রাচ্য একজন দেশপ্রেমিক ও মানব জাতি একজন মহান সেবক হারাল। **জর্জ মার্শাল**—(যুক্ত-রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব)—গান্ধীজী মনুষ্য জাতির বিবেক। **ডি ভ্যালেরা**—ভারত আজ রাত্রে সর্বস্বান্ত হয়েছে। সৌহার্দ্য স্থাপনই তাঁর জীবনের সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ। **জেনারেল স্মাটস**—গভীর শোকানুভব করছি। গান্ধীজী শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন, আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতাম। শ্রেষ্ঠ পুরুষ চলে গেলেন। **মিঃ চার্চিল**—ঘৃণিত অপরাধে স্তম্ভিত। **লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো**—ভবিষ্যত ভারতের অদৃষ্টে কি নিহিত আছে বলা যায় না। **ম্যাক আর্থার**—সর্বজনমান্য নেতার নির্বোধ হত্যা ঘৃণিত ঘটনা। তিনি শান্তির প্রতীক ছিলেন। **চিলির প্রেসিডেণ্ট**—তাঁর শোচনীয় মৃত্যুতে জগতের ক্ষতি হল। সকল প্রকার হিংসার নিন্দা করা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। **মিসেস রুজভেল্ট**—তাঁর মৃত্যু ভারতের পক্ষে চরম আঘাত। বিশ্ববাসী তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। **পোপ**—তিনি শান্তির অগ্রদূত ও খৃষ্টানদের বন্ধু। **রেভারেণ্ড হোমস**—পৃথিবীকে ঠিক করতে হবে যে তারা আণবিক বোমার পক্ষপাতী না গান্ধীজীর সমর্থক। মানুষের ভিতরকার ঐশী শক্তি জগতকে জয় করতে পারে—ইহাই গান্ধীজীর বাণী। **আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট**—তাঁর দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির আদর্শে জগদ্বাসী উদ্বুদ্ধ হক এই প্রার্থনা করি। **কাহ্নুর্ন উপজাতির সর্দ্দার**—মালঙ্গ বাবার (গান্ধীজী পাঠানদের মধ্যে এই নামে পরিচিত) হত্যায় শোকাভিভূত। আমার অনুগামীগণ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে **চেকোশ্লোভাকিয়ার স্পীকার**—গান্ধীজী প্রেম, করুণা, দয়া ও ভ্রাতৃত্বের

অগ্রদূত। পৃথিবীর কর্তব্য নিজের বিবেক অনুসন্ধান করা ও গান্ধীজীর ব্রত পূর্ণ করা। **প্রধান মন্ত্রী, পর্তুগাল**—গান্ধীজী বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক নেতা। **সুইস প্রেসিডেণ্ট**—শান্তি দূতের অসাধারণ প্রতীক। **শ্রীঅরবিন্দ**—যে আলোক বর্তিকা আমাদের স্বাধীনতার পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহা প্রজ্বলিত থাকবে। স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের মা তাঁর সন্তানদের তাঁর চতুর্দিকে সমবেত করবেন।

ব্রহ্মের, ব্রিটিশের ও ব্রেজিলের পররাষ্ট্র সচিব, আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর জেনারেল, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি, ব্রহ্মের প্রেসিডেণ্ট মিস গ্রিস ক্রোজিয়ার, লর্ড পেথিক লরেন্স, লর্ড লিষ্টওয়েল, মিঃ এমেরী, অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী, আফগান সর্দারগণ, দক্ষিণ আফ্রিকার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কমিটি, আগা খাঁ, পর্তুগালের, জাপানের, ফিন্‌ল্যাণ্ডের, ডেনমার্কের, মিশরের, আফগানিস্থানের, সিংহলের, কানাডার ও ইরাণের প্রধান মন্ত্রী, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট, ডাঃ হিউলেইনসন, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, আরব লীগের সেক্রেটারি জেনারেল, ওয়াকৎ দলের নেতা, তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট, নরওয়ের পররাষ্ট্র সচিব, ইন্দোনেশিয়ার সহ সভাপতি, ফরাসীর পররাষ্ট্র সচিব, মিঃ লুম, মিঃ কেসী, ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি, ব্রিটিশের সহঃ প্রধান মন্ত্রী, মিঃ এলেকজাণ্ডার, নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েটের, ব্রিটিশের, চীনের, পাকিস্থানের, ইউক্রেনের, যুক্তরাষ্ট্রের, সিরিয়ার, ফ্রান্সের ও কানাডার প্রতিনিধি, মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন, নাটাল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, কলম্বিয়ার ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট, ডাঃ ইউসুফ দাদু, মিঃ ফিলিপস্, কিউবার রাষ্ট্রদূত, কলম্বোর গভর্ণর, জাঞ্জিবারের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট, সুদানের গভর্ণর জেনারেল, কিউবা ও হাওয়াইয়ের রাজকুমার, লেবাননের প্রেসিডেণ্ট, আবিসিনিয়ার রাজা,

রাবাতের সেক্রেটারি জেনারেল, তুর্ক জাতীয় পরিষদ, দালাই লামা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বহু বিশিষ্ট নেতা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। (ভারতীয় নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে।)

গান্ধীজী যে রকম জাতিধর্ম নির্বিশেষে জগৎবাসীর শ্রদ্ধা পেয়েছেন কোন সময়ে কোন দেশের কোন জাতির কোন ধর্মগুরু বা সম্রাট বা নেতা বা ধনী ব্যক্তি এ-রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি পান নি। এত ব্যাপকভাবে কারও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মৃতি-তর্পণ, নদীগর্ভে ভস্ম-বিসর্জন হয়নি। কারও মৃত্যুতে এত ব্যাপক হরতাল, অরন্ধন, উপবাস, শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়নি। কারও মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হয়ে এত লোক প্রাণত্যাগ করেনি। অন্ততঃ ইতিহাসে এ সকলের কোন নজির পাওয়া যায়না।

কংগ্রেসের প্রতি সর্বশেষ উপদেশ—(সংক্ষেপে)

"কংগ্রেস দেশের সর্বপ্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অহিংস পথে ইহা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনেছে। এখন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে স্বাধীন হতে হবে। রাজনৈতিক বন্ধন-মুক্তি অপেক্ষা শেষোক্ত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কঠোরতর, কারণ ইহা গঠনমূলক, উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বাহ্যাড়ম্বর এর মধ্যে কিছুই নাই। সকলের ইহাতে সহযোগিতা প্রয়োজন। কংগ্রেস মাত্র প্রাথমিক অধিকার লাভ করেছে। কংগ্রেসের অগ্নিপরীক্ষা এখনও বাকী। কংগ্রেস কতকগুলি দুর্নীতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ঐগুলি নামে মাত্র জনপ্রিয় ও গণতন্ত্রসম্মত। কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য তালিকা (এক কোটি) বাতিল করে দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ ভুয়া সদস্যদের নাম আছে। বাজে লোকের নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত লোকের নাম দিয়ে রেজেষ্টারি তৈরী করতে হবে। ইহা ভোটাধিকারী নরনারীর তালিকার মত হবে। ইহাতে সেবকদের তালিকা থাকবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে সহরবাসীদের নিয়ে এই

তালিকা করতে হবে। পল্লীবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে। এই সকল দেশ-সেবককে আইনসম্মতভাবে স্ব স্ব অঞ্চলের নরনারীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। বহু নরনারী তাদের হয়ত খোসামোদে প্রবৃত্ত হবেন। এ অবস্থায় শুধু খাঁটি কর্মীরাই সফল হতে পারে। যেরূপ দ্রুতগতিতে কংগ্রেসের মর্যাদা হ্রাস পাচ্ছে, একমাত্র এই পন্থাতেই তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কংগ্রেসকে দেখাতে হবে ইহা ভৃত্যদের সেবকদের প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

কংগ্রেসের জন্য খসড়া প্রস্তাব-শেষ দলিল—কংগ্রেসের ক্ষীয়মান মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে গান্ধীজী নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করেন:— "প্রচার ব্যবস্থা ও পার্লামেণ্টারি কার্যকলাপের পরিচালনার যন্ত্র হিসাবে কংগ্রেসের কাজ ফুরিয়েছে। ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ গ্রামের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা লাভ হয়নি। রাজনৈতিক দল ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অশুভ প্রতিযোগিতা হতে ইহাকে মুক্ত রাখতে হবে। এই হেতু ও অন্যবিধ কারণে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতি বর্তমান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দিতে এবং নিম্নলিখিত বিধান অনুসারে **লোক-সেবক সঙ্ঘে** পরিণত করতে প্রস্তাব গ্রহণ করছে।—(ক) পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক পল্লীমনা নরনারী নিয়ে পঞ্চায়েৎ গঠন করতে হবে। দুইটি সন্নিহিত পঞ্চায়েৎ দ্বারা নির্বাচিত নেতার অধীনে কার্যপরিচালনাকারী দল থাকবে। এইরূপ একশত পঞ্চায়েতের নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ নির্বাচন করবে। এইরূপ গঠনতন্ত্র চলবে। সমগ্র ভারতে এইভাবে পঞ্চায়েৎ গোষ্ঠী-গঠন করা হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ পরস্পরযোগে সমগ্র ভারতের জন্য কাজ করবেন। (খ) প্রত্যেক কর্মীকে সর্বদা নিজ হাতে-কাটা সূতায় কিংবা

নিখিল ভারত চরকা-সংঘের অনুমোদিত সূতায় প্রস্তুত খাদি পরতে হবে, পানদোষ বর্জন করতে হবে। হিন্দু কর্মীকে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে। সকলকে সকল ধর্মে সমশ্রদ্ধাশীল, সাম্প্রদায়িক মিলনাদর্শে বিশ্বাসী, সকলের সমান সুযোগ ও অধিকারে বিশ্বাসী হতে হবে। প্রত্যেক কর্মী পল্লীবাসীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করবেন। তিনি পল্লীকর্মীদের শিক্ষা দিয়ে তালিকা প্রস্তুত করবেন। কর্মী নিজের দৈনন্দিন কার্যের ডায়েরী রাখবেন। তিনি কুটির-শিল্প ও কৃষির মারফত পল্লীবাসীদের আত্মনির্ভরশীল করবেন। তিনি তাহাদিগকে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয় শিক্ষা দিবেন। তিনি তাহাদিগকে নয়া তালিম পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিবেন। তিনি প্রকৃত লোককে ভোটার তালিকাভুক্ত করবেন। তিনি সংঘের নিয়ম মেনে চলবেন। সেবক-সংঘ (অর্থাৎ কংগ্রেস) নিখিল ভাবত চরকা সংঘ, নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ, হিন্দুস্থানী তালিম সংঘ, হরিজন সেবক সংঘ, গো-সেবা সংঘ অনুমোদন করবে।"

অহিংস বিপ্লবের অষ্টাদশ সূত্র :—সমাজবাদের সর্বাধুনিক আদর্শ হিসাবে গান্ধীজী অষ্টাদশ কর্মধারার প্রবর্তন করেন। গান্ধীদর্শনের সমস্ত কিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত :—(১) **সাম্প্রদায়িক একতা**—ভারতের প্রত্যেককে প্রত্যেক লোকের সঙ্গে একত্ববোধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে এবং সকল ধর্মে সম শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। (২) **অস্পৃশ্যতা বর্জন**—প্রত্যেক হিন্দু সেবা ও সাহচর্যের দ্বারা হরিজনকে আপন করবে। (৩) **মাদক নিবারণ**—লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মাদক দ্রব্য ত্যাগ কোরে অভিশপ্ত জীবন থেকে বাঁচতে হবে। (৪) **খাদি**—খাদি প্রচার দ্বারা আর্থিক স্বাতন্ত্র্য, সাম্যপ্রবর্তন ও স্বদেশী মনোভাব স্থাপিত হবে। (৫) **পল্লী শিল্প পুনঃস্থাপন**—ধান ভানা, গম পেষা, সাবান তৈরী, কাগজ ও দেশলাই তৈরী প্রভৃতি পল্লী-শিল্প খাদির সহায়তারূপে

থাকবে। (৬) **পল্লী-স্বাস্থ্য উদ্ধার**। (৭) **বনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন**—ভারতের চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু তার সঙ্গে সহরের ও গ্রামের সকলের সংযোগ রাখবার শিক্ষা পদ্ধতি। ইহা শরীর ও মনকে গড়ে তোলে। (৮) **বয়স্ক শিক্ষা**। (৯) **নারী শিক্ষা**—সমাজে নারী পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার শিক্ষা ও মর্যাদা পাবে। (১০) **স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা ও পালন**—ইহার অভাবে অধিকাংশ রোগের সৃষ্টি হয়। (১১) **প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা**—ইংরাজি ভাষার বেশী আদরের জন্য জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে। ভারতীয় ভাষা দরিদ্র হয়ে পড়েছে। (১২) **রাষ্ট্র ভাষা**—হিন্দীই সহজ ভাষা। ইহা বেশী সংখ্যক লোক জানে এবং বোঝে। (১৩) **ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠা**—ইহা দ্বারা ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের অবসান হবে। মুষ্টিমেয় ধনীদের হাত থেকে প্রচুর ধন লক্ষ লক্ষ অর্ধভুক্ত নরনারীকে দিতে হবে। (১৪) **কৃষকের উন্নতি**—ভারতে কৃষকেরাই সংখ্যায় বেশী। ইহাদের অভিযোগের প্রতিকার করা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাহাদের ব্যবহার করা চলবে না। (১৫) **শ্রমিক সংঘ গঠন**—আমেদাবাদের শ্রমিক সংঘের আদর্শে সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ অহিংসার উপর ভিত্তি কোরে শ্রমিক-সংঘ গঠন করতে হবে এবং অহিংসভাবে ধর্মঘট পরিচালনা করতে হবে। (১৬) **আদিবাসীর উন্নতি**—জাতির প্রত্যেক অংশ যাতে অন্য অংশের সঙ্গে একত্ব-বোধ করতে পারে এবং একজাতিত্বের দাবির সত্যতা যাতে প্রমাণিত হয় সেজন্য আদিবাসীদের সেবা ও গঠন করা দরকার। (১৭) **কুষ্ঠরোগী**—ইহারা সমাজের অঙ্গ এবং ইহাদের অবহেলা করা বা ঘৃণা করা উচিৎ নয়। (১৮) **ছাত্র**—ইহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে।

গান্ধীজীর প্রিয় রামধুন সঙ্গীত :—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম।
মঙ্গল-পরশন রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম॥
শুভ-শান্তি-বিধায়ক রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম।
বরাভয়-দানরত রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম॥
নির্ভয় কর প্রভু রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম॥
দীন-দয়াল প্রভু রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
সবকো সন্‌মতি দে ভগবান।
রাজারাম, জয় সীতারাম
পতিত-পাবন সীতারাম॥

জয়হিন্দ